রজব আলী
তিনপুতের
বাপ
ফজলুর রহমান জুয়েল

রজব আলী
তিনপুতের বাপ

ফজলুর রহমান জুয়েল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

রজব আলী

তিনপুতের বাপ

ফজলুর রহমান জুয়েল

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ ফজলুর রহমান জুয়েল

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

ROJOB ALI TINPUTER BAP: Fazlur Rahman Jewel, Published by: SM Raisuddin Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Price : Tk. 100.00, US$ 4.00 **ISBN. 984-493-103-7**

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

আজকের বাংলাদেশে
মূলধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ
অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর করকমলে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে তরুণ লেখক ও সাংবাদিক ফজলুর রহমান জুয়েল নতুন প্রজন্মের খ্যাতিমান লেখকদের অন্যতম। ইতিমধ্যে কলাম, উপন্যাস ও ইতিহাস-নির্ভর কথাসাহিত্যের উপর তাঁর বেশ ক'টি বই বেরিয়েছে। বইগুলো বেশ পাঠক নন্দিতও হয়েছে। উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়েছে দেশের বরেণ্য কবি আল মাহমুদসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকার সাহিত্য সমালোচনায়। তাঁর উপন্যাস *চান্দু সরকার উপাখ্যান* অবলম্বনে জনপ্রিয় টেলিফিল্মও নির্মিত হয়েছে।

ফজলুর রহমান জুয়েল এর বই পড়তে শুরু করলে তা আদ্যোপান্ত শেষ করতে মনে মুগ্ধতা জাগায়, বিদগ্ধ পাঠকদের এ জাতীয় মন্তব্যে আমরা উদ্বুদ্ধ। এবারের একুশে বই মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড থেকে বের হল ফজলুর রহমান জুয়েল এর উপন্যাস *রজব আলী তিনপুত্রের বাপ*।

শিল্পের আঙ্গিক ও ভাববিন্যাস বিচারে *রজব আলী তিনপুতের বাপ* একটি বিচিত্র ও ভিন্নধর্মী রোমাঞ্চরসের উপন্যাস বলা যায়। যার কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে গ্রাম-বাংলার এক বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ অগাধ ভাটি অঞ্চলের পটভূমি আর সেখানকার জীবনধারা নিয়ে। আবহমান গ্রাম-বাংলার রূপ-সৌন্দর্য আর গ্রামীণ জীবনের নানা চমকপ্রদ ঘটনা কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য। সেখানকার অশিক্ষিত সমাজের নানা আজব স্বভাব, সততা, আন্তরিকতা, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি হৃদয়ের টান, অজ্ঞতা, কুসংস্কারসহ সকল কিছুর বাস্তব নমুনা ফুটে উঠেছে কাহিনীর নানা পরতে। তাঁদের জীবনাচারের সৌন্দর্য এবং অভাব দু'টো বিষয়ই লেখক তুলে ধরেছেন নান্দনিকভাবে। তরুণ লেখক ও সাংবাদিক ফজলুর রহমান জুয়েল এর *রজব আলী তিনপুতের বাপ* উপন্যাস টির সাফল্য সম্পর্কে আমরা দৃঢ় আশাবাদী। যা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে চিন্তার খোরাক যোগাবে বোদ্ধামহলে, এ-ই আমাদের বিশ্বাস।

(এস এম রইসউদ্দীন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

বাংলা গীতিকা-সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব ময়মনসিংহ নামে পরিচিত বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বাঞ্চলীয় অগাধ ভাটির দুর্গম এক জনপদের পটভূমিতে এই কাহিনী লিখিত। এ-তে তরীকপাশা, আখলাকপুর, রহমপুর, ওলীপুর, উজীরপুর, কাজীপুর বাজার, মাইঝ্যা বিল, ছইয়া বিল, উজানী নগর-এই নামগুলো কাল্পনিক।

www.pathagar.com

রজব আলী তিনপুতের বাপ
ফজলুর রহমান জুয়েল

॥ ১ ॥

ভর-দুপুর বেলা।

আষাঢ় মাস শেষ হতে আরো ক'দিন বাকী। আষাঢ়ের পর শ্রাবণ। তারপর ভাদ্র। অথচ এখনই আকাশে ভাদ্রমাসীয় বিচিত্ররূপ। কিছুক্ষণ আগে ছিল প্রখর রোদ। মুহূর্তে আবার আকস্মিক শোঁ-শোঁ বৃষ্টি। তরীকপাশা গ্রামের একাংশে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটায় মাটি একদফা ভিজে কাইয়ের মতো নরম হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি গ্রামের অন্য অংশে রোদের ঝলসানি। শুকনো খটখটে মাটি। ভ্যাপসা গরম। বায়ূ চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। পাড়া-গাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে নাকে এসে লাগছে পাকা তালের মনমাতানো গন্ধ। ঋতু পরিবর্তন আর কৃষকের ফসল তোলার সময়কালকে কেন্দ্র করে যে-বাংলামাস গণনা করা হয়, তাতে অনেক সময়ই বাস্তবতার সাথে গড়মিল থাকে। এবারও তাই হয়েছে বুঝি। ভাদ্রমাসের আমেজ এসে গেছে এখনই।

কোথাও কোনো শানবাঁধানো অট্টালিকা নেই। নেই ইট-পাথরের কায়কারবার। ছন-বাঁশের চালাঘর সারিবেঁধে ছড়ানো আছে সারা গ্রামজুড়ে। তাতে ছোট ছোট বাচাটি ঘরের সংখ্যাই বেশী। মাঝে চিকচিক-করা ঢেউটিনের ঘর দুটো- একটা। লোকজনের মধ্যে কেমন যেন জবুথবুভাব।

গ্রামে চলাচলের মেঠোপথের সাথে অনেক বাড়ীর উঠোন একলেপচা হয়ে মিশে আছে। কোনো কোনো বাড়ী আবার খানিকটা দূরে। বেউড় বাঁশ আর মুলিবাঁশের আড়ালে। সবগুলো বাড়ীই করমচা, ডুমুর, মাদার, আম, জাম, তেঁতুল, নারিকেল ইত্যাদি শো শো রকমের গাছপালার ছায়াঢাকা। ঝি-বধুদের কোমল হাতের যত্নে বাড়ীগুলোর খাদে খাদে সজ্জিত হয়ে আছে ডাঁটা, কুমড়ো, ঢেঁড়স, ঝিঙে আর চিচিঙ্গার বাগান। পথের দু'পাশে কোথাও ঝোপবাঁধা শেওড়াবন। কোথাও কাঁশবন। থোকে থোকে আছে বাসক, ছাতিম, কাউয়াঠুঁটি আর দলকলসী ফুলের ছড়াছড়ি। পায়ের নীচে ঘন সবুজ দুর্বাঘাসের চাদর। এরকম মায়াভরা অপরূপ দৃশ্য ধারণ করে গ্রামের

www.pathagar.com

মেঠোপথটি উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে হাওড়-লাগোয়া অসংখ্য নালা-নর্দমার বুক চিরে।

সারাক্ষণ কানে আসে হাঁস-মোরগ আর গরু-ছাগলের নানা কলরব। হাজারো পাখ-পাখালির কিচিরমিচির। শালিকই আছে কয়েক প্রকারের। এক প্রকারের শালিকরা কয়েক শো জড়ো হয়ে পৃথক একটি জিওলগাছ পুরো দখলে নিয়ে রেখেছে নিজেরা। কেন জানি অন্যদের সাথে তাদের মেশামেশি নেই। আকৃতি আর রূপ-স্বাতন্ত্র্যের কারণে খুব সহজে চোখে পড়ছে হলদে পাখি এবং লেজঝোলা পাখিরা। আর সজনে ডালে নিজেদের বসার জায়গাটি পাকে পাকে ঘিরে পুচ্ছ নাড়িয়ে উল্লাস করছে যে-সবুজ পাখিরা, লেজের আগায় তাদের সুঁচের মতো চিকন পালক। মানুষ ডাকে তাদের সুঁইচোর। কত রকমের যে পাখি ! হিসেব জানা কঠিন। বক, দাঁড়কাক, টিয়ে, ভিমরাজ, ডাহুক, হাঁড়িচাঁচা – অনেক।

সামনে বাড়ীর খিলের কোণায় রাস্তার পাশে বড় একটা ডেউয়াগাছ। গাছতলায় মধ্যবয়সী একটা লোক বিবস্ত্র। ছোঁ মেরে মাটি থেকে লুঙ্গী টেনে নিয়ে পরছে। আহত বাঘের মতো দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। যেন কী বলবে-কী না, ভেবে পাচ্ছে না।

আচমকা এই অভাবিত দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে এনজিও-কর্মকর্তা অনীল নাথ নির্বাক হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর এনজিও'র কার্যক্রম এই অগাধ ভাটি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দিশপাশ বুঝতে তরীকপাশা এসেছেন। সাথে সহকর্মী মিল্টন বাবু। দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তরীকপাশা এই অথই হাওড়-অঞ্চলের পশ্চাৎপদ এক দূর্গম ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ জনপদ। গ্রামের পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে বিশাল আকাশটা নুয়ে হাওড়ের দূরপ্রসারিত পানির সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে। কারণ মাইল তিনেকের মাঝে কোনো জনপদ নেই। সাগরের মতো বিস্তৃত শুধু হাওড়ের পানি আর পানি। দক্ষিণে দূরে লম্বা রশির মতো কালো যে জিনিসটা পানিতে লেপ্টে আছে, সেটা বিরাট এক গ্রাম। এখান থেকে প্রায় দু'মাইল। পূর্ব পাশে অবশ্য মাত্র আধ মাইল পেরোলেই বাড়ীঘর-লোকজন আছে। দেখাও যায় পরিষ্কারই সব। আর উত্তর দিকে? হ্যাঁ, এদিকেই কেবল ভূ-খন্ডের যোগাযোগ অন্য গাঁও-গেরামের সাথে।

বাড়ীর ঘাটলায় পানিতে ছেলেমেয়েরা হই হুল্লোড় করে লাফঝাঁপ দিচ্ছে। শাড়ি-আঁচল দিয়ে মাথায় সুন্দর করে পর্দা এঁটে গাঁয়ের বধুরা হাঁড়িকুড়ি ধুচ্ছেন। কোথাও ঘাটলায় বসে মায়েরা সন্তানদের গা-গতর মেজে গোসল করাচ্ছেন। কোথাও আবার

www.pathagar.com

মহিলারা লগি হাতে একাকী নৌকো বেয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। অনেকের লগিও লাগে না। পানিতে বৈঠার মতো ঝপাঝপ হাত মেরে চলে যাচ্ছে নৌকো নিয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পারদর্শী নৌকো চালনায়।

বিচিত্র আর অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার যে কত! সীমা-সরহদ্দ নেই। সে-সব বিষয়ে যাওয়ার আগে এনজিও কর্মকর্তাদের কথা শেষ হয়ে যাক।

মিল্টন বাবু বললন, 'স্যার! ওইদিকে জমির আইল থেকে কোনাচে-পথে উলুছনের ঝাড়ঝোড় মাড়িয়ে চুল-আউলা একটা মহিলা দৌড়ে গেছে। সকালবেলা আমরা আসার পথে যে-মহিলাকে ঘাসের চাঙারি মাথায় লয়ে কোমর দুলিয়ে হাঁকপাঁক করে হাঁটতে দেখেছিলাম, এটা সেই মহিলাই মনে হল।

অনীল বাবুর চিন্তা-ভাবনা আছে, আগামীতে নিজেই এনজিও একখান খুলে বসবেন। ক্ষুদ্রঋণের নামে গ্রামের মানুষকে সুদের ওপর টাকা ধার দেবেন। মাস শেষে বড় অংকের লাভের টাকা গুনবেন। তাই তিনি চাকুরীর পাশাপাশি গ্রাম-বাংলার 'মুক্তি'র সন্ধানে গ্রামীণ জীবনধারা নিয়ে ঢের গবেষণাও করছেন। গ্রামে এসে একটু ব্যতিক্রমী কিছু চোখে পড়লেই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ফেনা তোলেন। তিনি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললেন, 'বিষয় বুঝলাম না!'

ডেউয়াগাছতলার ওই দৃশ্য অবলোকনের প্রেক্ষিতে মিল্টন বাবুর মনেও বিস্ময়ভরা কৌতুহল। কিন্তু তাঁর আবার অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি-মাতামাতি পছন্দ না। তিনি বুঝে গেছেন, বস্ এখন ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠবেন। অনর্থক ক্যাট ক্যাট করে আঁতুড়ি পর্যন্ত খিজলাতে শুরু করবেন। বসের মন রক্ষার্থে জবাব দিয়ে যেতে হবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও শোনাতে হবে। মনে বিরক্তি চেপে বললেন, 'আমাদের অত বোঝাবুঝির কী দরকার? আমরা যে-মতলব নিয়ে এসেছি, সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। চলুন স্যার আমরা হাঁটি।'

ঃ না-না। ঘটনাটা একটু বুঝতে হবে। দৌড়ে যাওয়ার সময় মহিলাটিকে খুব লজ্জিত ও ফরিয়াদী মনে হয়েছে কি?

ঃ না। সেরকম কিছু মনে হয় নি। তবে একটু-একটু লুকোচুরিভাব দেখা গেছে।

ঃ কী রকম?

ঃ মানে কেউ দেখে ফেলল কি না, এ-রকম আশংকা হয়তো তাঁর মনে ছিল।

ঃ বুঝলে কেমন করে?

ঃ মহিলাটি দৌড়ে যাওয়ার সময় পালিয়ে আসা শেয়ালের মতো কেবল পেছনে, ডানে এবং বামে বার বার মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে।

www.pathagar.com

ঃ ওর গায়ের কাপড় কেমন দেখলে? ছেঁড়াখুঁড়া?

ঃ অতটা অবশ্য লক্ষ্য করতে পারি নি। তবে কাপড়-চোপড় অক্ষতই সম্ভবত।

ঃ কোনো শোর-চিৎকার করেছিল?

ঃ কী যে বলেন স্যার ! তবে তো আমি একা না, আপনিও শুনতেন।

ঃ আমার কোনো কিছুই ধারণায় আসে নি। বাদ দিন স্যার ওসব। চলুন আমরা পথ-আগাই।

ঃ আশপাশে বাড়ির পাঁদাড়েও লোক আছে দেখা যায়। আমাদের চেয়ে তাঁরা আরো অনেক কিছু দেখেছে নিশ্চয়। কেউই তো কিছু বলছে না। বুঝলাম না কিছুই।

দু'জন নতুন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে এলাকার ছোট ছেলেমেয়েরা ঝাঁক বেঁধেছে। নালার ওপারে তেউড়ি লতার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁরা তামাশা উপভোগ করছে এই শার্ট-প্যান্ট পরা চোখে কালো চশমাওলা দু' এনজিও-কর্মকর্তা দেখে। দেখাদেখি বয়স্ক লোক এসেও শামিল হয়েছেন ক'জন। এঁদের সাথে আলাপ করে আসল ঘটনা অনুধাবনে সক্ষম হলেন কর্মকর্তারা। গাছতলার ওই লোকটির নাম রজব আলী। কিছুক্ষণ আগে একজন মানুষকে পিটিয়েছে। সে-মানুষটা আর কেউ নয়, তাঁর বউ; ভবানির মা। আর বিবস্ত্র হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল নিছক দুর্ঘটনা। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে লুঙ্গী খুলে গিয়েছিল। এ-রকম ঘটনা নাকি আবার ঘটেও হরহামেশা। আর তা শুধু রজব আলীর একারও নয়। এই পাড়ায় আরো কেউ কেউ বউপেটাতে গিয়ে কত শোরগোল বাঁধায়। এ আর তাজ্জবের কিংবা দোষের কি?

অনীল বাবু সহকর্মী মিল্টন বাবুকে নিয়ে খুব তাজ্জবের সাথে ঘটনা পর্যালোচনা করছেন। সমাজে মুর্খতার অন্ধকার আজো কত প্রকট ! দেশে এমন কোনো থানা, ইউনিয়ন কিংবা গ্রাম বাদ আছে কি, যেখানে এ-রকম দু'চারজন বউ-নিপীড়ক রজব আলী নেই? এঁদের স্বভাব এমন কেন? এঁদের ভালো করা যায় কিভাবে? অনীল বাবু বললেন, 'এঁদের মধ্যে আমাদের হাজার বছরের সেই চিরায়ত বাঙালি চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। সেজন্যে একটা উপায় হল, পয়লা বৈশাখের শিক্ষা এঁদের শেখাতে হবে সঠিকভাবে।

ঃ হাজার বছর আগে তো এখানকার সমাজে বিস্তৃত ছিল শোষণ আর কুসংস্কার। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার যুগও তো সেটাই ছিল। আপনি এঁদের সে-যুগে ফিরিয়ে নেবেন বলছেন স্যার?

অনীল বাবু কোনা কথা বলছেন না। গম্ভীর চেহারায় নীচ দিকে তাকিয়ে আছেন। মিল্টন বাবু চিবিয়ে চিবিয়ে আবার কথা শুরু করছেন, 'তাছাড়া হাজার বছর আগের

www.pathagar.com

জীবনাচারের সাথে পয়লা বৈশাখের বোধ-বিশ্বাস কিংবা চেতনাগত সম্পর্কই বা কতটুকু?'

ঃ কেন?

ঃ বাংলা সন মোগল বংশীয় মুসলমানদের শাসনামলের স্মৃতি। ঈসায়ী ১৫৭৬ সনে আমাদের এই বঙ্গদেশ যখন দিল্লীর বাদশাহ আকবরের শাসনাধীন হল, তখন এই অঞ্চলের ফসলী খাজনা আদায়ে এখানকার ফসল তোলার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাস গণনার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। কারণ তাতে জনসাধারণের সুবিধে হবে। ফলে তাই করা হল। প্রবর্তন হল বাংলাসন। শাহী দরবারের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহ উল্লাহ সিরাজী ছিলেন এর উদ্ভাবক। অতএব, বাংলা সনের যে কোনো মাস বলেন, এর সাথে সম্পর্ক খুঁজলে পাওয়া যাবে আমাদের রাষ্ট্র, প্রশাসন আর রাজস্ব ব্যবস্থার ঐতিহ্যের। ঠিক না স্যার? আর বাংলা নববর্ষ পালনের রেওয়াজ তো শুরু হল এই সেদিন। ঊনিশ শতক থেকে।

প্রসঙ্গের ইতি টানতে অনীল বাবু বললেন, 'এসব নিয়ে তুমি-আমি তর্ক করার স্বার্থকতা নেই। আমাদের অত ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির অবকাশ কই? চাকরী-বাকরী করে ইতিহাস পড়ার সুযোগ আছে? মুসলমান আর হিন্দু, পৃথক দুই বোধ-বিশ্বাস ও কৃষ্টি-কালচারের নাম। পৃথক দু'জাতি। তুমি খৃষ্ট ধর্মের লোক। তোমার নিজধর্মের মাহাত্ম্য কতটুকু, তা নিয়ে পারলে ভাব। অন্যেরটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। এনজিও-কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কিছু করতে হলে হেড অফিস থেকে নির্দেশনা আসবে। ব্যস, আর কী ! দাঁড়িয়ে সময় লস্ না-করে চলো আমরা যাই। হালকা বৃষ্টিতে পথ ভিজে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাতে আজ একেবারে উচিৎ শিক্ষা হয়ে যাবে দু'জনের। নৌকোতে ওঠার আগে আমাদের কম করে হলেও অন্তত আরো দেড় কি. মি. জায়গা হাঁটতে হবে।'

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আমি পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে না-গিয়ে পারছি না। চেয়ে দেখো, কেমন আশ্চর্য! ওই লোক মুহূর্তে আবার লোকদের সাথে কেমন স্বাভাবিক হাসিখুশী আলাপ করছে ! এমন বীভৎস একটা কান্ড ঘটিয়েও কেমন ভাবলেশহীন মানুষটা!

ঃ সবই অভিজ্ঞতা। বুঝলেন স্যার? গ্রাম-গ্রামান্তর না-ঘুরলে কোথায় পেতেন এমন অভিজ্ঞতা? শুধু অগাধ ভাটির এই তরীকপাশা গ্রামেই নয়। সারা দেশে গ্রামাঞ্চলে গভীর মমতা আর সরলতার ফাঁকে এ-রকম হাজারো জঘন্য মুর্খতা আছে একশ্রেণীর মানুষের জীবনে, যা নিজ চোখে না-দেখলে বোঝা যায় না। আমি রংপুর, রাজশাহী,

www.pathagar.com

খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট-অনেক জায়গা ঘুরেছি। অনেক দেখেছি। আপনি এনজিও-চাকুরীতে এসেছেন নতুন। দেখেন নি হয়তো।

ঃ তোমার কথা ঠিক বটে। তবে আমার কি মনে হয় জান? সত্যিকার উপভোগ্য জায়গা আসলে শহর নয়। গ্রামই। সমস্যা যা দেখছি, রাস্তাঘাটের অভাব। নেই ভালো কেনাকাটার সুবিধে। অবশ্য আরো কিছু বিষয়ও আছে। শহরের চেয়ে গ্রামে মুর্খতার প্রকোপ বেশী। এখানে আছে রজব আলী আর ভবানির মা'রা। যাঁদের আচার-অভ্যেস যেমন আজব ও রহস্যজনক। তেমনি স্বচ্ছতা-সরলতারও কমতি নেই। এ-আরেক মজার জগতই বটে। আমার ইচ্ছে হয় কি শুনবে? ভবিষ্যতে বাড়ী করলে শহরে নয় গ্রামেই করব।

দু'জনে বিস্ময়কর নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে হেঁটে চলে গেলেন নৌকোঘাটের পথে মিঠামইন পৌছার লক্ষ্যে। সন্ধ্যা নামার আগেই পৌছাতে হবে সুদূর কিশোরগঞ্জে।

তাঁরা এ-কথা জানলে হয়তো আরো বিস্মিত হতেন, তরীকপাশা গ্রামে বউপেটানো বলতে গেলে পুরো সুনামের ব্যাপার। সমাজের অনেক লোকজন এ-কাজে নীরব বাহবা দেয়। মুরব্বীরা নাকি বলে গেছেন, ঘরে বউ থাকলে দোষ করবেই। আর দোষ না-করলে কেউ নিজের বউকে পেটায় না। তার মানে বউপেটানো কেবল বাহাদুরীই নয়, প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক ঘটনাও।

বিয়ের পর নিজ স্ত্রীর প্রতি কারো গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেলে সে-লোক 'মাইগ্যা' আখ্যা লাভ করে। মাইগ্যা মানে বউপাগল। অপরদিকে যে শোরগোল করে বউপেটাতে পারে, লোকের চোখে তাঁর আলাদা কৃতিত্ব। লোকজন আলাপচারিতায় বলাবলি করে, ওই বাড়ী অমুক, বাপেরব্যাটা। বউয়ের সাথে খাতির নেই। তেরিমেরি করলে একেবারে কড়া শাসন।

॥ ২ ॥

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন ভবানির মা'র ঘরে মেয়ে আছে। সেই মেয়ের নাম ভবানি। কিন্তু তা সঠিক নয়। ভবানির মা'র তিন সন্তানের সকলেই পুত্র। জজ মিয়া, দারোগা মিয়া আর ঝাড়ু মিয়া।

ভবানির মা'র স্বামী রজব আলী মামলায় পড়ে একবার তিনমাস জেল খেটেছে। তখন সে বিয়ে করেনি। কোর্ট-কাচারীর খবর তাঁর জানা। সেখানে একজন আছেন জজ। এই জজ সাহেব হুকুম দিলে মানুষের জেল হয়। ফাঁসীও হয়। আবার জজ সাহেব বললে মানুষ জেল থেকে মুক্তিও পেয়ে যায়। অতএব উনার চেয়ে বড় আর

www.pathagar.com

কে? তাই রজব আলী যেদিন তাঁর প্রথম সন্তানের মুখ দেখল, সেদিন একধরনের উচ্চাকাংখার সাথে সেই সন্তানের নাম রাখল জজ মিয়া। একেবারে বড় নাম।

দ্বিতীয় ছেলে দারোগা মিয়ার নামের পেছনের ঘটনাও একই রকম। রজব আলী দেখেছে, জজ সাহেবের পর পরই ক্ষমতাধর ব্যক্তি যিনি, তিনি থানার দারোগা। কত বড় বড় জমিদার, চেয়ারম্যান, মেম্বার- সকলকেই ওই দারোগাব্যাটা ধরে নিয়ে যেতে পারে। আটকানোর ক্ষমতা নেই কারো। ইচ্ছেমতো পেটালেও কেউ কিছু বলতে পারে না। গাঁও-গেরামের কারো লাঠির জোর এই দারোগা মিয়ার সাথে চলে না। এই ব্যাটার মতো ক্ষমতা আর কার আছে? তাই পরবর্তী ছেলের নাম দারোগা মিয়া।

তবে ছোটছেলে ঝাড়ু মিয়ার নামের ঘটনা ভিন্ন। দুই ছেলের পর তৃতীয় বারে যখন ভবানির মা গর্ভবতী, তখন রজব আলীর আশা ছিল কন্যাসন্তান হবে। তাই মনে মনে নামও পছন্দ করে রেখেছিল, বেহুলা না-হয় ববিতা। প্রথমটি পালাগানের আসরে শোনা নাম। দ্বিতীয়টি সিনেমায়। কিন্তু আশা বাস্তব হয়নি। আগের মতোই ছেলে জন্ম হয়েছে। ফলে সে মনে মনে খুব বিরক্ত হয়। গোস্‌সাভরে নাম রেখেছে ঝাড়ু মিয়া।

প্রতিটি সন্তানের জন্মের পরই ভবানির মা তাঁর জানামতো কর্তব্য পালনে কোনো অবহেলা করে নি। সে মহল্লার ইমাম সাহেবেকে দাওয়াত করিয়ে আনাতে তৎপর ছিল। কারণ তাঁর আবার সময়- সময় দোয়া-শিরণীর আয়োজনে কোনো সময়ই ভূল হয় না। এ-সব নিয়ে স্বামীর ওপর তাঁর অন্যরকম খবরদারী আছে। কখন মহর্‌রমের চাঁদ উঠবে; কখন রবিউল আউয়াল মাস আসবে; শবে মেরাজ, শবে বরাত আসতে কত বাকী; শবে কদর আসছে কবে- সব হিসেব তাঁর নখদর্পনে থাকে। আঙুল গুনে চান্দ্র মাসের তারিখ বের করা দেখলে মনে হবে তাকে জীবন্ত ক্যালেন্ডার।

তিনপুত্রের নাম রাখার দিনগুলোতে ইমাম সাহেব আসার পর আঁতুড়ঘরে শায়িত থেকেও সে খবর রেখেছে, সবকিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না। ইমাম সাহেবের তামদারীতে ভূল-বেআদবী হল কি না। ইমাম সাহেব খেয়েদেয়ে দোয়া করে গেছেন। পাড়ার লোকও এসে খেয়েছে। কিন্তু ইমাম সাহেব মাদ্রাসা-শিক্ষিত আলেম না-হওয়ায় নবজাত শিশুর জজ-দারোগার মতো আজব নাম রাখায় বারণ করেননি। দিতে পারেন নি ইসলামসম্মত নাম রাখার কোনো নির্দেশ।

ভবানির মা'র কোনো মেয়ে সন্তানই নেই। তবু কেমন করে এই মহিলা ভবানির মা হল? হ্যাঁ-সেটাই কথা।

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস, শিবের পত্নী দেবী দূর্গার আরেক নাম ভবানি। কিন্তু আমাদের এই ভবানির মা তো আর হিন্দু নয়। সে মুসলমান। মুসলমান ঘরের এই মহিলার হিন্দুয়ানী নামের অন্যরকম ইতিহাস আছে।

ভবানির মা'র আসল নাম আলাতন বিবি। স্বামীর ঘরে আসার পর হয়েছে ভবানির মা।

এই অঞ্চলে শ্বশুর-শাশুড়িসহ বড়রা নববধুকে নামধরে ডাকেন না। বেআদবী বোধ করেন। তাই নববধুর একটি উপনাম দেয়া হয়। এটাই রেওয়াজ। ইতিপূর্বে ভবানির মা'র বড় জাল দু'জন যখন এ বাড়ীতে নববধু হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রথমজন এংরাজের মা নামে পরিচিত হয়েছেন। পরবর্তীজনের নাম দেয়া হয়েছিল ভিমরাজের মা। দু'জনের বয়সই এখন বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে। আজো তাঁরা স্বামীর সংসারে এ-নামেই সকলের নিকট পরিচিত আছেন। নামকরণের এই কাজটা সমাধা করেছিলেন শ্বশুর-শাশুড়িরা। ভবানির মা'র নামও তাঁরাই রেখেছিলেন। তাঁদের কেউই আজ বেঁচে নেই।

উপযুক্ত জ্ঞান না-থাকলে নিতান্ত ধর্মপ্রাণ হওয়ার পরও মানুষ বেইসলামী বা ইসলামবহির্ভূত অনেক ব্যাপার-স্যাপার বোঝে না কিছু। সমাজের নানা ধর্ম-নানা মতাদর্শে প্রভাবিত হয় বেমালুম। ভবানির মা'র নামকরণেও যে সে-কাণ্ডটাই ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামী-স্ত্রী দু'জন আর তিনপুত্র। এই পাঁচজন নিয়ে ভবানির মা'র পরিবার।

তিনপুত্রের সকলেই সংসারের কাজকর্ম করে। হাওড়ে-বিলে কিংবা গাঁও-গেরামে-সবখানেই তাঁদের দাপট আছে।

স্বামী রজব আলী আছে বেচারা নিজের তালে। পরিবারের ছোটখাটো ভালোমন্দের ধার ধারে না। খাওয়ার সময় এসে চারটে খায়। তা-ও কেবল রাত আর সকালে। দুপুরের খাওয়া মাঝে মধ্যে খায়। সপ্তাহে দুয়েকদিন। জুতো পায়ে ছাতা একটা হাতে নিয়ে সারাদিন গাঁও-গেরামে ঘুরোঘুরি করাই তাঁর কাজ। এলাকায় সর্দারী করে। ভবানির মা'র জানা মতে 'মাষ্টরী' ও করে। যেহেতু তাঁর স্বামী আবার লেখাপড়া জানা লোক।

পুত্ররাই সংসারের চালিকাশক্তি। ভবানির মা করে তত্ত্বাবধান। বাড়ীঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম সামাল দেয়। তম্মধ্যে রান্নাবান্না ছাড়াও অনেক কাজ তাঁর। ধান ভেনে চাল তৈরী করতে হয়। মাসে দুইমন দশ সের চাল লাগে তাঁদের। রজব আলী ছাড়া সকলেই পরিশ্রমী। পরিশ্রমী মানুষের খাবার লাগে পর্যাপ্ত। খাবারের পুরো চাল ভবানির

www.pathagar.com

মাকে একাই ঢেঁকিপাড় দিয়ে তৈরী করতে হয়। তারপর রয়েছে লাকড়ির যোগাড়। মরাপাতা কুড়ানো, ডালপালা কেটে আনা, গোবর দিয়ে চটা বানিয়ে যত্ন করে রোদে শোকানো- সব করতে হয় তাঁকে।

ভবানির মা নিজেকে অসুখী মনে করে না। তাঁর দৃষ্টিতে সে সুখী। তাঁর মনে হতাশা নেই। কিছু না-পাওয়ার বেদনা নেই। বিলে আছে মাছ। ঘরে আছে গোলাভরা ধান। তিন-তিনটে পুত্র আছে। তাঁর মতো নারীর আর কী লাগে?

দুঃখ যেটুকু আছে, তা শুধু একটাই। স্বামীর জ্বালাতন। রজব আলী বদমেজাজী মানুষ। একেবারে আস্ত গোঁয়ারগোবিন্দ। তেরিয়ারও একশেষ। বাইরে গেলে লোকের সাথে আলাপকালে লোকটার মুখ থেকে মধু পড়ে। কিন্তু ঘরে এলে বউয়ের কাছে মুখে যেন আগুন নিয়ে আসে। কথায় কথায় বকাঝকা সাড়। একটু হেরফের হলেই ঝগড়াঝাঁটি-মারপিট করে।

এই মারপিটের কারণে ভবানির মা নিরূপায় হয়ে অনেকবার বাপেরবাড়ী আব্দুল্লাহ্‌পুরে গিয়ে আটকে গেছে। এমন বদ মানুষের ঘর আর করবে না বলে। কিন্তু প্রতিবারই বাপচাচারা তাকে পুত্রদের দেখিয়ে শান্তনা দিয়েছেন। অভয় দিয়েছেন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ঠেলে পাঠিয়েছেন স্বামীরবাড়ীতে। তাদের কথা একটাই, 'পুত্রসন্তান বাইচ্যা থাইক্‌লে অভাগী মায়ের কপাল ঘুইচ্যা যায়।' এ-কথা শুনে শুনে তিনপুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে সকল বেদনা বুকে গুজে রেখেছে। স্বপ্ন দেখেছে ভবিষ্যত-সুখের। এ-ভাবেই দিনে দিনে জীবন কাটিয়ে এসেছে ভবানির মা।

ছেলেপুলে বড় হলে মায়ের কপাল খোলে। স্বামীর মার খাওয়া ঘোচে। এ-কথা সবাই বলে। কিন্তু ভবানির মা'র বেলায় তা হয়নি। এখনো স্বামী রজব আলী বর্বরের মতো তাকে মারপিট করে। অবশ্য আগের চেয়ে মাত্রাটা একটু কমে এসেছে। এখন মাসে দুয়েকবার মাত্র ঘটে ব্যাপারটা। আগে এক-দু'দিন পর পরই ঘটত। কথায় কথায় গায়ে লাথি-তামচা পড়ত। বাপ-মায়ে গালি শুনত।

বিয়ের পর মনের মানুষের হাতে মারপিট খেতে নিজেকে খুব শরমিন্দা লাগত ভবানির মা'র। পতিপ্রাণা যুবতির কোমল হৃদয় ছারখার হয়ে যেত। প্রথমদিন মার খাওয়ার স্মৃতি আজো মনে আছে তাঁর।

বিয়ের মাত্র সপ্তাহ দুয়েক পরের ঘটনা। ভবানির মা অন্যান্য দিনের মতো রান্না করেছে। আলু কেটে শুঁটকি দিয়ে পাকানো সালুন। স্বামী রজব আলী দুপুরে এসে খেতে বসেছে। মাটির শানকিতে পানিভাত। সাথে দুটো কাঁচামরিচ। ভাত থেকে সাদা ধোঁওয়া উড়ছে। ঝোল বেশী দেওয়ায় সালুনের স্বাদ ছিল কম। ঝালের পরিমাণও কমে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

স্বামী অল্প খেয়েই সালুনের কটোরা ছুঁড়ে মারল ভবানির মা'র ওপর। তারপর ঠোঁট কামড়ে চেঁড়িয়ে উঠল, 'বান্দীর ঝি! এইডা আমার পাতে কি জিনিস দিলি?'

ভবানির মা হতভম্ব হয়ে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে। তা দেখে স্বামী আরো চটে গেল। আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে খিঁচাতে লাগল, 'মইচের (মরিচের) বাতাসও নাই। এত্ত আইল্না (এত স্বাদহীন) সালুন দি মাইন্সে খায়? এইডা তোর হাতের পাক করা সালুন? না হাত-ধোওয়া পানি? তোর মা-বাবা তোরে কিছু শিখাইছে না ?'

বেচারি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। মুহূর্তেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বামী। তারপর ডানদিকে মোড় নিয়ে তেড়ে এল। ভবানির মা'র পেছনের দিকে কোমরে কয়েক লাথি দিয়ে খাবার ফেলে বেরিয়ে গেল।

শ্বশুর-শাশুড়িরা সেদিন একে অপরের দিকে চেয়ে মুখটিপে হাসছিলেন। আত্মগৌরবের হাসি। পাশের কোঠায় গিয়ে ফিসফিস করে বলছিলেন, 'বোঝা গ্যাছে। লক্ষণ বোঝা গ্যাছে। পুত আমার মাইগ্যা অইতু না।'

ভবানির মা'র দিনে দিনে আর লজ্জা-শরম নেই এখন। দূর হয়ে গেছে। পাশের বাড়ীর শ্বশুর-ভাশুর-মান্যজন আর নানা বয়সী ছেলেমেয়ে-সকলের চোখের সামনে স্বামীর লাথি-তামচা খেতে আজকাল আর মোটেও বিব্রতবোধ হয় না তাঁর। এ-সব সংসার-জীবনের স্বাভাবিক হইচইয়ের মতোই মনে হয়। তাছাড়া লোকের সামনে স্বামীর মারপিট খেতে তুচ্ছ একটা শান্তনাও আছে। কারণ তাতে অনেকে মন্তব্য করে, 'ভবানির মা সাংঘাতিক একটা ভালা মাইন্সের বাইচ্যা (ভালো মানুষের বাচ্চা)। এক্কেরে মাটির চাকা।'

ভবানির মা ধরে নিয়েছে, পুরুষমানুষের মাথা গরম থাকে। কিছু করার নেই। মেয়েমানুষ বুঝে-সুঝে রয়ে-সয়ে চলতে হয়। এই রকম ধারণার ওপর নির্ভর করে তাঁর দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ কালটা কেটে এসেছে।

পিটুনি এখন ভবানির মা'র সবদিক থেকে গায়ে-সওয়া হয়ে গেছে। এ-পর্যন্ত তিন-তিনটে সন্তানের মা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় সে এখন সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশ আঘাতে আঘাতে একধরনের শক্ত হয়ে গেছে। সাধারণ আঘাতে সহজে ব্যথা অনুভব হয় না। তার ওপর আবার আয়ত্ত হয়ে গেছে আত্মরক্ষার নানা কৌশলও। সবচেয়ে বড় সুবিধে যেটা, তা হল ভবানির মা'র শরীর যেরকম হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী, রজব আলী সে তুলনায় হীনবল।

মারপিটের সময় দূর্বল লোকেরা শক্তিপ্রয়োগের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় কৌশলে। আর গায়ে জোর থাকলে মানুষ এর বিপরীত করে। হীনবল রজব আলী তাঁর রুইমাছের

www.pathagar.com

মতো তরতাজা বউকে পেটাতে গিয়ে কিছু কৌশল অবলম্বন করে। রাগের মাথায় কথা বলতে বলতে হাতের কাছে লাঠি-ঝাঁটা যা পায়, তা নিয়েই আকস্মিকভাবে শুরু করে ঠুস-ঠাস বাড়ি। বাড়ি দেয় আবার সহনীয় পর্যায়ের। খুব জোরে না। তবে রজব আলীর তোড়জোর দেখলে কিংবা ভবানির মা'র হা-হতোস্মি শুনলে মনে হবে মারাত্মক ধুন্ধুমার কাণ্ড বুঝি। বউকে হিঁচড়ে টেনে নেয় খোলা জায়গায়। চলতে থাকে পিটুনি। পিটুনির প্রথম দফাতেই আরো এক কৌশল অবলম্বন করে। খাবলে ধরে ফেলে ভবানির মা'র আউলা চুল। যাতে ধাক্কা খেয়ে নিজে ছিটকে না-পড়ে যায়। কিন্তু ভবানির মা'র যে দিনে-দিনে আত্মরক্ষার সকল পাল্টাকৌশলও রপ্ত করা। তাই যেদিন দেখবে সে মাথার চুলে ধরা খেয়ে গেছে, সেদিন বুঝবে আজ আর রক্ষে নেই। পায়ের লাথি, হাতের ঘুসি আর লাঠি-ঝাঁটার বাড়ি- সব একযোগে এসে শরীরে পড়বে। তখন ধস্তাধস্তির ফাঁকে কৌশল করে হেঁচকা টান মেরে রজব আলীর লুঙ্গী খুলে ফেলে দেয়। তাতে ঘটে অভাবিত আরেক দুর্ঘটনা। ফলে ভবানির মা'র চুলমুঠো ছেড়ে রজব আলী তাড়াহুড়ো করে পরনের কাপড় পূনঃস্থাপন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সুযোগে ভবানির মা দৌড়ে পালায় প্রতিবেশীর ঘরে। কোনো দিন খড়ের গাঁদার নীচে। না-হয় ঝোপড়ার আড়ালে।

স্বামীর মারপিট নিয়ে বিচার-বৈঠক একবারই হয়েছিল।

বাপেরবাড়ী আব্দুল্লাহ্‌পুরে পাকা একমাস ধরে আটক আলাতন বিবি (ভবানির মা)। দারোগা মিয়া তখন পাথালিকোলা শিশু। বাপেরবাড়ীতে 'ছুড়ু চাচাজীর' ছাপরা ঘরে দুই গেরামের গণ্যমান্য মুরব্বী ব্যক্তিরা একত্রে 'বৈডক'-এ বসেছিলেন। আজো সব মনে আছে ভবানির মা'র। দুঃখের স্মৃতি সহজে ভোলা যায় না।

তখন ছিল শ্রাবণ মাস। বিকেলবেলা। ছাপরা ঘরের ভেতর মুরব্বীরা মীমাংসা-সমঝোতার কথাবার্তা বলছিলেন। ভবানির মা তাঁর কোলেরশিশু দারোগাকে কাঁখে করে দাঁড়িয়েছিল ঘরের বাইরে বেড়ার আড়ালে। আকাশে মেঘের ভেলা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভেসে যাচ্ছিল। মেঘের দিকে তাকিয়ে ভবানির মা ব্যাকুল হয়ে কান পেতে ধরে রেখেছিল ঘরের ভেতর। কিন্তু এতগুলো লোকের কোলাহল থেকে কথা স্পষ্টভাবে বাইরে আসছিল না। শুধু তিন-চারটে হুক্কা একযোগে টানার গড়গড় আওয়াজ আর এরই ফাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী লোকগুলোর খুঁক-খুঁক কাশি ছাড়া বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না ভেতরের কথাবার্তা। ভবানির মা'র মনে তখন উদ্বেগ আর হতাশা শুধু বেড়ে যাচ্ছিল। আগের রাতে ঘুম হয় নি। খাওয়াও হয় নি ঠিকমতো। তাই চোখে ছিল প্রচন্ড রকমের জ্বলুনি। মাথায় ছিল ধরা। পেটে ছিল খিদের যন্ত্রণা।

www.pathagar.com

সেদিন জজের বাপ (রজব আলী) সকলের সামনে আল্লাহ্ তালার নামে কিরা কেটে (শপথ করে) এসেছিল, আর কোনো দিন কটুকথা কইবে না। মারপিট করবে না। কিন্তু লোকটা তাঁর শপথ রক্ষা করে নি। বদলায় নি তাঁর খাসলত।

সুখ-দুঃখে দিন কাটিয়ে ভবানির মা আজ তিন পুত্রের মা। পুত্ররা এখন উপযুক্ত হয়েছে। ভবানির মা'র এখন নাতি-নাতনি দেখার সময় এসেছে। কিন্তু আজো তাঁর মারপিটের কপাল ঘোচে নি। এ-সব নিয়ে অতীতের নানা শ্বাসরুদ্ধকর স্মৃতির কথা ভবানির মা'র মন থেকে কিছুতেই সরতে চায় না।

রজব আলীর সাথে তাঁর বিয়ে হবার কথা ছিল না। বিয়ে পাকাপাকি ছিল অন্য জায়গায়। আখলাকপুরের কদর মুন্সীর ছেলের সাথে। বিয়ের দিন-তারিখও ধার্য হয়ে গিয়েছিল। ১৩ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার। কিন্তু উত্তরমহল্লার কানাই পোদ্দার শুনে বারণ করল, 'শাওন মাইস্যা বিয়া (শ্রাবণমাসীয় বিয়ে) অইতে মানা আছে।' সে খুব গুঢ়তত্ত্ব বোঝাবার মতো ভাব করে গম্ভীর কণ্ঠে শোনাল-

শাওনে অইছিল বিয়া
বিপুলা সুন্দরী।
কাল রাইত্কুর মাঝে বেটি
অই গেছিলা রাঁড়ি।
এর লাগি শাওন মাসে
বিয়া অইতে মানা।
এই মানা করিয়া গেছুইন
ময়-মুরব্বীদানা।

বিয়ে পিছিয়ে গেল। শ্রাবণ মাসে হবে না। ভাদ্র মাসে হবে। কিন্তু তা মেনে নিলেন না ছেলের বাবা আখলাকপুরের কদর মুন্সী। তাঁর এককথা যে, শ্রাবণ মাসে বিয়ে-অনুষ্ঠান করা যাবে না, এটা অলীক বিশ্বাসী লোকদের প্রবাদ-প্রবচন। মুসলমানদের সেটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। অতএব যে লোক এ-জাতীয় কথা শুনে মেয়ের বিয়ে পিছিয়ে দিতে পারে, তাঁর সাথে আত্মীয়তা নয়।

বিয়ে বাতিল হয়ে গেল।

পরে ফাল্গুন মাসে বিয়ে ঠিক হল আখলাকপুর থেকে আরো দু'মাইল উজিয়ে কাজীপুর বাজারের দক্ষিণে। তরীকপাশা গ্রামের রজব আলীর সাথে। মৃত ফজর আলীর পুত্র। ছেলে তিন ভাই দু'বোনের সবার ছোট। ঢাকীর হাওড়, মাইঝ্যা বিল আর ছইয়া বিলে তিন ভাইয়ের ধানী জমিই আছে আট-দশ কুড়া। বাড়ীতে চৌচালা

www.pathagar.com

ঘর দু'খানা। একখানাতে টিনের বেড়া-টিনের ছানি। উলুছনের আটচালাও একখানা। গাবর (চাকর) খাটে দু'জন। উকিল (ঘটক) জানিয়েছে, ছেলে লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত। ক্লাশ টু পাশ। এলাকায় একটু-একটু 'মাষ্টরী' ও করে। অবশা কি কাজ করতে জানলে মাষ্টরী করা হয়, তখনকার দিনে সেটা কেউ না-বুঝলেও একে অপরকে গুঁতো দিয়ে ঠারাঠারি করেছিল। ফিসফিসিয়ে বলছিল যে, মাষ্টরী করা খেলাকথা না। মাথা লাগে। বিদ্যা লাগে। ভবানির মা'র বাপ-চাচারা বলেছিলেন, 'ছোকরা এইডা অরিনের বাইচ্যা (হরিণের বাচ্চা)। হাজারে-বিজারে একখান মিলে কি না।'

কিন্তু তকদীরের ফের। আবারো বিয়ে বাতিলের পালা। কারণ এ-গাঁ থেকে ও-গাঁয়ে মুখে মুখে চাউড় হয়ে গেছে, যে- ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে দ্যাশ-গেরামে ছাপ্পামারা। জেল খেটে এসেছে। একটু পাগলাটে ধরনের। মানুষের সাথে বিবাদ- হাঙ্গামায় নামকরা। এ-কথা শুনে কনের বাবা ছুরত ব্যাপারী থমকে গেলেন, এমন ছেলের কাছে মেয়ে দেয়া যায় না। পরে অনেক কথাবার্তা আর চিন্তা-ভাবনার পর ছুরত ব্যাপারী মত দিলেন ছেলে রজব আলীর 'ভাতেরঘর' দেখে। ভাতেরঘর মানে যে ঘরে ভাতের অভাব নেই। ধানী জমি পর্যাপ্ত। পরিবারের সকলে সারা বছর তিনবেলা পেট ভরে খাওয়ার মতো ধান ফলে। শেষপর্যন্ত মত দেবার পর ছুরত ব্যাপারী বেদনার সুরে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, 'আমার বাইতে (বাড়ীতে) আমার মাইয়্যাডা ভাতের লাগি জবর কষ্ট কইর্ছে। ভাতের ঘর দ্যাইখ্যা অহন দিতাছি। আমার সোনাময়না পাখী পেট ভইরা খাইতে পাইর্বু।'

বিয়েতে দেনমোহর ছিল আড়াই কুড়ি এক (একান্ন) টাকা। যৌতুক দাবী ছিল জামকাঠের ছাপরখাট এবং মাঝারি একটা হালের বলদ দিতে হবে। সাথে দিতে হবে ঘড়ি আর রেডিও। আর ঘরকরনার ঘটিবাটি তো না-চাইতেও দিতে হয়। ছুরত ব্যাপারী তাঁর পাট-ব্যবসার সমূদয় টাকা-পয়সা খরচ করে বরপক্ষের সকল দাবী পুরণ করেছিলেন সেই ভাতেরঘর দেখেই।

আজকাল সম-বয়সী মহিলাদের নিয়ে ভবানির মা যখন মাথার উকুনবাছার আসরে বসে, তখন নীরব আড্ডা জমে। ভবানির মা অতীতের সে-সব কথা খুঁটিয়ে মনে করে। লম্বা গপ্‌পো জুড়ে অন্যদের শুনিয়ে একধরনের মানসিক হালকাবোধ করে। মজাও পায়। এ-জাতীয় আড্ডাতে বসে প্রায়ই বলে, 'আমার জিন্দিগানিডা গো ভইন খালি কাইনি আর কাইনি' (আমার জীবনটা গো বোন শুধু কাহিনী আর কাহিনী)। অন্যরা তখন কেউ দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নীরব একাত্মতা জানায়। আর কেউ বলে, 'কাইনি আমারও আছে।' এই বলে অন্যরা জুড়ে নিজেদের জীবনের নানাকথা।

www.pathagar.com

॥ ৩ ॥

রজব আলী মাইগ্যা নয়- এই ধারণা সমাজে জাগরূক রাখতে রজব আলী বউয়ের সাথে জনসমক্ষে রূঢ় আচরণ করে। স্বাধীনমতো নেচে নেচে পেটায়। সমাজের দৃষ্টিগোচরের লক্ষ্যে ঘরের বাইরে উঠোনে এসে পেটায়। কখনো রাস্তার পাশে গাছতলায়।

এলাকার একশ্রেণীর লোক রজব আলীর এ-সব কীর্তিকান্ড পছন্দ করেন না মোটেও। ঘৃণার চোখে দেখেন। তাঁরা রজব আলীর চোখে 'বেশী বড়লোক'। তাঁদের এড়িয়ে চলে সে। এ-নিয়ে তাঁর আবার গর্ববোধও আছে, 'বেশী বড়লোক গো পাত্তা দিতে অত্ত ঠেহায়না (অত ঠেকায় না) আমি। আমি বড়লোক কোনো হালারও ধার ধারি না।'

তরীকপাশারই বাসিন্দা হাজী আসমতুল্লাহ্ খন্দকার। তাঁর বংশের অনেকে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে ব্যবসা করেন। অনেক শিক্ষিত লোক আছে তাঁদের মাঝে। কিন্তু রজব আলী তাঁদের সাথে মেশে না। সে এলাকায় তাঁর পৃথক সমাজ নিয়ে চলে। কিন্তু 'বড়লোক' যদি হন অন্য এলাকার, তাহলে আছে রজব আলী। তখন গায়ে পড়ে সম্পর্ক বজায় রাখতে উদগ্রীব থাকে। এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ-মেম্বার ধনু মিয়ার বাড়ীতে রজব আলী চাকর-বাকরের মতো ফুট-ফরমাশ খাটতেও দ্বিধা করে না। কারণ ধনু মিয়ার বাড়ী অন্য এলাকায়। পাশের গ্রাম ওলীপুরে।

রজব আলীর বউ ভবানির মা একটু লাজুক ও চাপা স্বভাবের। তবে বেজায় পাখোয়াজ মহিলা। চলাফেরা আর কথাবার্তায় কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। যা বলবে, একদম কাট কাট। স্বামীর ওঠাবসা-চলাফেরা সবকিছুতেই তাঁর নজরদারী আছে। কি ঘরে, কি বাইরে; খুঁটিনাটি কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। নিজ এলাকার ক্ষমতাশালী লোকদের নিয়ে মিলেমিশে চলতে সে অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছে স্বামীকে। তা অবশ্য বেশদিন আগের কথা। কিন্তু না। বেশী বলতে গিয়ে বিপত্তি ঘটেছে অনেকবার। রজব আলী ক্ষিপ্ত হয়ে এ-নিয়েও ভবানির মাকে পেটাতে কম পেটায় নি। কারণ তাঁর বিশ্বাস, ঘরের বউ যেদিন থেকে ঘর রেখে বাইরের ব্যাপারে নাক গলাবে, সেদিন থেকে ঘরের লক্ষ্মী আর থাকবেন না। স্বেচ্ছায় বিদেয় নিয়ে চলে যাবেন অন্যের ঘরে।

রজব আলীর শরীরে কোনো উন্নতি নেই। স্বাস্থ্যের প্রতি নেই তাঁর লক্ষ। পেটে বহুদিন থেকে গ্যাষ্ট্রিকের সমস্যা। ভালো চিকিৎসা করায় না। মিঠামইন গেলে সেখানকার পরিচিত একটা ওষুধের দোকান থেকে দুটো-একটা এন্টাসিড ট্যাবলেট

www.pathagar.com

কিনে এনে খায়। এ-ভাবে নিজের মনগড়া মতো ওষুধ কিনে এনে খেতে নিজেকে ছোটখাটো ডাক্তার ভাবতেও আনন্দ আছে তাঁর। পাড়াগাঁয়ে তৈরী সালসা সেবন করেছে বেশদিন। কাজ হয়নি। তাঁর আবার সামান্য পড়ালেখাও আছে। নিজ এলাকায় নাম-দস্তখত জানা একমাত্র ব্যক্তিত্ব। এলাকার মানুষ তাকে মাষ্টর বলে ডাকে।

উপার্জনমূলক কোনো কাজ করে না রজব আলী। জমিজমা-গেরিস্থ সব ছেলেদের ওপর নির্ভর। আর কাজকর্মই বা কেমন করে করবে? একে তো 'মাষ্টর' সাব মানুষ। তার ওপর আবার তাঁর ঘরে তিন পুত্র। কারো এ-রকম টাটকা জোয়ান তিন পুত্র থাকা মানে এলাকার মার-দাঙ্গায় শক্তিশালী তিন-তিনটে লাঠি। এ-যে সামাজিক বাহাদুরীর ব্যাপার। সকলে সমীহ করে। এ-রকম ভাগ্যবান বাপ গোবরগণেশ সেজে সারাদিন অকর্মার মতো বাবুগিরি করে না-চললে লোকে বলবে কি?

রজব আলী মাঝে মধ্যে কোমরে ডোলা ঝুলিয়ে জাল হাতে বিলে যেত মাছ মারতে।

বিলে বউটুবানি-বনকলমির ঝোপ আর ভাসমান কচুরিপানার নীচে ছোটমাছ থাকে। পালবেঁধে ঘুরে বেড়ায় দাঁড়িকানা পরিষ্কার পানিতে। জালে ওঠার পর কী যে অপরূপ লাগে! ঝলমল রুপোর দ্যুতি ছড়ানো এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়াবি শরীরে। মুঠোভর্তি করে ধরে এদের ডোলায় ভরার মজাই আলাদা। বাইন মাছগুলোর পছন্দ আবর্জনাতলার কাঁদামাটি। এদের জালের বদলে কায়দা করে হাতিয়ে ধরতেই অধিক সুবিধে। পুঁটি, টেংরা-আরো কত রকমের ছোটমাছ ! ছাঁক-জালি ঠেলে যেতে পারলেই হল। ঝকঝকে পয়সাকড়ির মতো ভেসে ওঠে জালে। তবে ছাঁকাটা দেয়া চাই যুত করে। ডিঙি বসেই হোক কিংবা হেঁটে হেঁটে হোক। এসময় বিস্তীর্ণ বিলের ঝিরঝিরে শীতল বাতাস এসে জুড়িয়ে দেয় শরীর। চোখের সামনে উড়োউড়ি করে গাঙশালিক আর পানকৌড়িরা। হৃদয়-মনে দোলা লাগে অন্যরকম আনন্দ।

কিন্তু আজকাল রজব আলী বিলে মাছমারার সে-আনন্দ থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে। কারণ পাড়ার লোকজন তাঁকে শরম দিয়েছে অনেকবার, 'আপনের মত লোকের মেনুত-মজুরী সাজে না। আপনে অইলেন তিন পুতেরবাপ।'

রজব আলী সেই থেকে স্থায়ীভাবে অকর্মা হয়ে গেছে। কাজকর্ম ছেড়েছুঁড়ে সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো এলাকার মেম্বারের পিছু পিছু ঘোরে। ধনু মেম্বার বয়সে তরুণ। লেখাপড়া জানা নেই। মেম্বারীর মতো বিশাল ও কঠিন ব্যাপার চালাতে একজন শিক্ষিত লোক সাথে থাকা খুব উপকারী। তাই ধনু মেম্বার রজব আলীর দামন ধরে রেখেছেন।

www.pathagar.com

সারাদিন মেম্বারের পিছু ঘুরে গভীর রাতে বাড়ী ফেরে রজব আলী। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমায় গিয়ে মাটিতে বিছানো একটা ভাঙ্গাচোরা পাটির ওপর ময়লাযুক্ত কাঁথার বিছানায়।

রজব আলী যে-ঘরটাতে শোয়, সেটা আটচালা। আষ্ট-বাইশে তৈরী। মানে প্রস্থ আট হাত আর দৈর্ঘ্য বাইশ হাত। তার সাথে দু'পাশে বারান্দা। বিশাল ঘরের ভেতরটা দেখতে সরকারী গুদামঘরের মতো। একেবারে সুনসান ফাঁকা। কোথাও ঘরকরনার গোছালো পরিকল্পনা নেই। নেই জিনিসপত্তর রাখার কোনো পরিপাটি। ঘরের মধ্যিখানের চেয়ে খানিকটা উত্তরে মোটা বাঁশের মাচানের ওপর স্থাপিত ধানের গোলা। তার উত্তর পাশে কোদাল, টুকরি, সেউতি, মটকা- এইসব এলোপাতাড়িভাবে রাখা। গরুর দিগদড়া, লাঙ্গলের জোত, মাছধরার জাল, নৌকোর কাছি- ইত্যাদি দড়িদড়াও আছে একগাঁদা। অন্যপাশে বেড়ার গায়ে ঝোলানো আছে গোটা তিনেক মোতরা আর হোগলার পাটি। দরোজার দিকে মাথার ওপরে ঝুলন্ত মাচায় রাখা আছে কয়টা তেল-চিটচিটে বালিশ আর কাঁথা। ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে বেড়ার সাথে লাগোয়া পুরনো আমলের কাঠের তৈরী বড় একটা সিন্দুক আছে। আর সারা ঘরময় ঝোলানো আছে পাটের তৈরী বেশকিছু শিকে। শিকেগুলোর কোনোটাতে বেঁতের ধুচনির ভেতর মশুর ডাল। তিলের বীজ। কোনোটাতে লাউয়ের খোলের ভেতর কুমড়ো-ডেঙোর বীজ। কোনোটাতে খুচরো টাকা-পয়সা। পান-সুপুরি। এ-রকম নানা কিছু।

রজব আলীর ঘরে কোনো খাট নেই। কি গরমকাল কিংবা শীতকাল, বিশাল ঘরের এককোণে সারাবছরই মাটিতে ছোট পাটি বিছিয়ে তাঁরা টেপাগোঁজা করে ঘুমায়। বিছানার পায়ের দিকে মানে পূর্ব পাশে কয়েকগাছি খড় রাখা আছে। বিছানায় যাওয়ার আগে তাতে পা মুছে নেয়। কারণ তাঁদের আবার পা ধুতে হয় না। খড়ে মুছে নিলেই চলে। পা ধুয়ে হবে কি? না-ধোওয়া পা'র চেয়ে বেশী ময়লা-আবর্জনা আছে কাঁথা আর বালিশে।

দৈনন্দিন জীবন যাপনে সাধারণত থাকা-খাওয়ায় কোনো অভাব অনুভূত হয় না তাঁদের। একটি অভাব আছে বহু বছর ধরে। তাহল বাড়ীতে মেহমান কারো থাকা পড়লে সংকট দেখা দেয় বালিশের। পরিবারের সদস্য-সংখ্যার অতিরিক্ত কোনো বালিশ নেই ঘরে। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে গরজও নেই কারো। অগত্যা কোনো আত্মীয়-স্বজন এসে রাতে থেকে গেলে নিজের বালিশ মেহমানকে দিয়ে রজব আলী বোঝা বহনের বিড়ে একটা এনে দিয়ে দেয় মাথার নীচে। আর ভবানির মা স্বামীর

www.pathagar.com

একটা লুঙ্গী এনে এর ভেতর কিছু ছেঁড়া কাপড় গুজে বোঁচকা বানিয়ে তৈরী করে নেয় তাঁর বালিশের বিকল্প।

ঘুমোনোর সময় মশারি টাঙানোর প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। সন্ধ্যাবেলা ভবানির মা খড় জ্বালিয়ে সারা ঘরে ধোঁয়া দেয়। তাতে মশা যেটুকু পালায়, তা-ই যথেষ্ট হয় তাঁদের। ময়লাভর্তি মশারি একটা আছে। কিন্তু এর ভেতর ঢুকলে ভবানির মা'র নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথায় 'উগাল' ছুটে। মশারি না-টাঙানোর ব্যাপারে রজব আলীর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

রজব আলী সকালবেলা ঘুম থেকে অনেক বেলা করে ওঠে।

আসমত খন্দকারের বাড়ীর লোকজন ভোরবেলা উঠে ফজর নামাজ পড়েন। অনেকে শেষরাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েন। সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত কেউ কেউ জায়নামাজে বসে জিকির-আযকার করেন। কুরআন তেলাওয়াতও করেন। কিন্তু রজব আলী নামাজ-কালামের ধার ধারে না। ভোর থেকে সকালবেলার সময়টাতেই তাঁর ঘুমটা একটু ভালো ধরে। এই সময় কেউ বিরক্ত করলে খুব রাগ করে।

দীর্ঘ বেলা পর ঘুম থেকে ওঠে রজব আলী। সামান্য একটা কুলি করে বাসিমুখ আর খালি পেটে চলে যায় ছলিমের টং দোকানে। সেখান বসে দেশ-বিদেশের নানা বিষয়-সংবাদ পর্যালোচনা চলে। মাগনা চা খাওয়ায় লোকজন। রজব আলী নিজের পকেট থেকে বিড়ি বের করে আয়েশ করে টানে। এ-ভাবে খালি পেটে প্রতিদিন আট- দশ কাপ চা-বিড়ি সাবাড় করার পর বাড়ী ফেরে। কাঁধে একটা লুঙ্গী ঝুলিয়ে বিলের ঘাটলায় চলে যায়। পেট-সমান পানিতে নেমে দু'কানে আঙুলচাপা দিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে ঝপাঝপ কয়েকটা ডুব দেয়। গোসল শেষ করে ভেজা লুঙ্গী গুটিয়ে দু'হাতে মুচড়িয়ে পানি ঝরায়। তারপর সেটা দিয়ে গা-গতর একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুছতে মুছতে ঘরে রওয়ানা দেয়।

লুঙ্গী রোদে দিয়ে ঘরে এসে রজব আলী সকালের খাবার খেতে বসে। এ-সময় খেতে ইচ্ছে করে না। মুখে রুচি নেই। পেটের খিদে মরে গেছে। তখন দোষ যা সব বউয়ের। সে ভালোমতো পাক জানে না।

খাওয়া থেকে উঠে এক টুকরো ভাঙ্গা আয়না নিয়ে মাথা আঁচড়ায়। হাতে-মুখে সরিষার তেল মাখে। পুরনো একটা আধ ময়লা শার্ট পরে গায়ে। কালিবিহীন একটা কলম আছে। সেটা গুজে নেয় বুকপকেটে। চোখে দেয় মোটা কালো ফ্রেমের একটি চশমাও। হাতে লাগায় *কেমী* কোম্পানীর তৈরী বছরত্রিশেক আগেকার সেই বিয়ের ঘড়িটা। পুরনো টায়ার-কাটা একজোড়া স্যান্ডেল আছে। সেগুলো পায়ে দিয়ে ঘরের

www.pathagar.com

মারুল থেকে টান দিয়ে ছাতাটা লয় হাতে। তারপর পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়ে। ফ্যাশন করে হাঁটা শুরু করে চটর-চটর আওয়াজে।

একটা ফুলপ্যান্টও আছে রজব আলীর। ছাইরঙের। অনেক দিনের পুরনো। মনমেজাজ একটু ফুরফুরে থাকলে মাঝে মাঝে সেটা পরে। যেদিন প্যান্ট পরে, সেদিন শিরদাঁড়া টানটান করে অন্যদিনের চেয়ে একটু ভিন্ন ভঙ্গীতে হাঁটা শুরু করে। কিন্তু ভবানির মা স্বামীর প্যান্ট পরা পছন্দ করে না। সে এই জিনিসটা পরতে দেখলে বিরূপ মন্তব্য করে, 'ঠ্যাংচিয়া লাগাইলে (ফুলপ্যান্ট পরলে) আপনেরে দ্যাখতে শয়তানের লাহান লাগে।'

ভবানির মা কোনো জবাব দেয় না। ঠোঁটে মোচড় কেটে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রজব আলী যেদিন প্যান্ট পরে বেরোয়, সেদিন তাঁকে হাঁটার সময় দেখতে খুব ব্যস্ত মনে হয়।

মেম্বারের সাথে সবদিন যাওয়া পড়ে না। সময় কাটানোর জন্যে রজব আলী ইঞ্জিনের নৌকো চড়ে কোনো কোনো দিন চলে যায় কাজীপুর বাজারে। কোনো দিন যায় সুদূর মিঠামইন। এলাকার নৌকোতে 'মাষ্টর' সাবের ভাড়া লাগে না।

বাজার থেকে ফেরার সময় রজব আলী কোনো কোনো দিন ওখানকার এক সংবাদপত্র বিক্রেতার নিকট যায়। দোকানের জিনিসপত্র বাঁধার কথা বলে সেখান থেকে দু'টাকা দিয়ে পুরনো একটা দৈনিক পত্রিকা কিনে নিয়ে আসে। মাষ্টর সাব মানুষ। বুকপকেটে কলাম আছে। হাতে পত্রিকা-কাগজপত্র ছাড়া শোভা পায় না।

রজব আলীর হাতে পত্রিকা দেখলে গ্রামের লোকজন উদগ্রীব হয়ে জানতে চায়, 'ও মাষ্টর ভাই ! দ্যাশের খবর কি ল্যাখছে?' রজব আলী তখন পুলকবোধ করে। কপালে ভাঁজ তুলে গাঢ়গলায় জবাব দেয়, 'আছে। ভালা-মন্দ দুইটাই।' কেউ বেশী কিছু জানতে চাইলে বলে, 'বাড়ীতে আইসো। পত্রিকা না-পইড়া কওন যাইবো না।'

আজ পত্রিকা হাতে রজব আলী বাড়ী পৌছুতে পারে নি। পথিমধ্যে নৌকোতে রহমপুরের মেন্দীর বাপের সাথে দেখা। তিনি তাঁকে নিজ বাড়ীতে হাতধরে টেনে নিয়ে গেছেন। দেশের খবর জানবেন। মেন্দীর বাপ বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে বেশ মাথা ঘামান।

রহমপুরে নিজবাড়ীর বাঁশতলায় রজব আলীকে নিয়ে বসলেন মেন্দীর বাপ। মনমাতানো শীতল ছায়া। খোলা বাতাস বইছে। পাশে দৃষ্টিনন্দন কচুগাছগুলো নৈসর্গিক আনন্দে মাথা দুলাচ্ছে। মেন্দীর বাপ প্রাথমিক পর্যায়ে এটা-সেটা বলে কাংখিত আলোচনা শুরুর আবহ তৈরী করছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে হেসে কথা বলছেন। জানতে

www.pathagar.com

চাচ্ছেন, রজব আলীর শরীর-স্বাস্থ্য কেমন? ঢাকা শহরে এখন বড় ডাক্তার কে? এইরকম নানা বিষয়।

আস্তে আস্তে লোকজন এসে একেবারে আসর জমে ওঠার অবস্থা। কেউ হুক্কা হাতে, কেউ পানের বাটা নিয়ে আসতে শুরু করেছে। বিশ্বে কি হচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থা কেমন, আলেম-উলামারা কি বলছেন, খালেদা জিয়া-শেখ হাসিনা-হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ-মাওলানা নিজামী, কে কি করছেন- সব জানা যাবে। সকলের চোখে-মুখে কৌতূহল -মুখর আনন্দ।

রজব আলী বসেছে একটা জলচৌকিতে। মুখে এক-খিলি পান পুরে দিয়েছে। বিড়ি ধরিয়ে দু'ঠোঁট ফাঁক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পত্রিকা মেলে ধরেছে। কিছু সময় চোখ বুলিয়ে বিভিন্ন শব্দ মনে মনে বানান করে শিরোনাম পড়ছে, 'ইরাক নিয়ে বুশ বিপাকে।' 'লন্ডনে তোপের মুখে টনি ব্লেয়ার'। 'বিশ্ব বাণিজ্য-ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা।' আধো-ভূল উচ্চারণ করল সকল ক্ষেত্রেই।

লোকজন নীরব। সকলে হা-করে চেয়ে শোনে।

পত্রিকার সকল কথা রজব আলী নিজেও বোঝে না। তাঁর উৎসাহী শ্রোতারা কোনো প্রশ্ন করলে মনগড়া কথাবার্তা বলে জবাব দেয়।

বৃদ্ধ মেন্দীর বাপ জানতে চালইলেন, 'লন্ডনের রাজা ডনি ফিলার (টনি ব্লেয়ার) আর বুশের কথা পরে বাণিজ্য কি কইলা বাবা বুইঝলাম না। তাঁরা বেপ্সা-বনিজে লাইম্বো নাহি (ব্যবসা-বাণিজ্যে নামবে নাকি?) হ্যাই মিয়ারা অহন এই কামে ল্যাইম্যা গ্যালে (নেমে গেলে) পিরথিমির শয়তানী চালাইবো কেডা?'

ঃ আপনের কথা ঠিহ্ (ঠিক) আছে। কিন্তু পেডের দায়ে না-কইরা উপায় আছে? সংসার চালাইতে ট্যাহার (টাকার) অভাব কার নাই? বুশের মাইযা যেডা বড় ইসকুলে পড়ে, হেইডার তলেই ত মাসে ট্যাহা লাগে বস্তা বস্তা। ক'দিন পরে যহন ব্যাটাদের রাজাগিরি চইল্যা যাইবো, তহন অত ট্যাহা বেপ্সা না-কইরা পাইবো কই?

সকলে গভীর উপলব্ধিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, 'হুঁ'।

যুবক নাইব আলী জানতে চাইল, 'মাষ্টর ভাই ! বুশ ব্যাটা দ্যাশে দ্যাশে যে মানুষ মারে, অত অস্ত্র পায় কই?

ঃ আরে কও কি ! হ্যায় (সে) নিজে বানায়।

ঃ নিজে বানায় ক্যামবায় মানে বুঝঝলাম না। নিজ আত দি বানায়? (নিজ হাত দিয়ে বানায়)।

ঃ মানে ধর না, তাইনের আজারে-বিজারে গাবর আছে। হ্যারা বানায়। (উনার

www.pathagar.com

হাজার হাজার কর্মচারী আছে। তাঁরা বানায়।) এ্যাত্তবড় রাজা অইয়া নিজ আত দি বানাইবো নাহি? তুমি পাগল অইছো?

ঃ বুইঝ্লাম। আপনেরে পাইলে বউত কিছু জানা যায়। আইচ্ছা, অত অস্ত্র কি দি বানায়?

ঃ হ্যার দ্যাশে মাটির তলে বারুদ আছে। বারুদ। হ্যাই জিনিস লোহার সাথে মিশাইয়া অস্ত্র বানায়। বড় বড় বোমা, ফাইটার বিমান, ক্ষেপাইন্যা অস্ত্র (ক্ষেপনাস্ত্র)- এইসব।

দীর্ঘ সময় ধরে চলল আলোচনা। বিষয়বস্তু অনেক কিছু। আমালিক (আওয়ামী লীগ) ইলেকশনে ভোট পাইবে কত, বিম্পি পাটি (বিএনপি) গাঁও-গেরামে রাস্তাঘাট বানাইছে, আলেমরা এক অইতে (ঐক্যবদ্ধ হতে) কত আছে বাকী-ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়।

আরেকজন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আসরে এসে যোগ দিলেন। তিনি এই পাড়ার মোড়ল। নাম হাজী রহমতুল্লাহ্। গত বছর এক ছেলে পাঠিয়েছেন মালয়েশিয়ায়। মাস কয়েক পর পর ছেলে টাকা পাঠায়। তিনি মালয়েশিয়ার খবর জানতে উদগ্রীব। এসে ঝপ করে বসেই প্রশ্ন করলেন, 'বাজান রে! মাল্লোশিরা দ্যাশের খবর-আখ্বর কি ল্যাহেছে (লিখেছে) কও হুনি।'

রজব আলী গাম্ভির্যের সাথে পত্রিকার এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চোখ বোলায়। তারপর বলে, 'নাহ্। আইজ্ ল্যাহে নাই কিছু।'

এই পাড়ার লোকেরা রেডিও শুনে দেশ-বিদেশের খবর লয়। সেদিন পাশের গ্রামের যুবকদের সাথে মারামারি বেঁধেছিল। দু'পক্ষে আহত হয়েছিল শতাধিক। যাঁরা আহত হয় নি, তাঁরা সন্ধ্যারাতে জটলা বেঁধেছিল রেডিও নিয়ে। বিবিসি বাংলা চ্যানেল ধরে অধীর আগ্রহে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে তাদের মারামারির খবরটা বিবিসি থেকে কীভাবে বিবৃত হয়, সেটা নিজ কানে শুনতে। কিন্তু না। এ-খবর বিবিসি থেকে সম্প্রচার হয় নি। তাই এক যুবক রজব আলীর নিকট জানতে চাইল, 'মাষ্টর ভাই! আমাগো (আমাদের) গেরামের হ্যাইদিনের এ্যাত্তবড় ঘটনাটা বিবিছি থেইক্যা কিছুই কইল না। বিবিছিও অহন আগের মত নাই মনে লইতাছে। না হি (না কী) কও মাষ্টর ভাই?'

রজব আলী কী জবাব দেবে? না। তাঁর জবাবের অভাব নেই। যে-আসরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোনো কিছুই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে না, সে-আসরে এমন প্রশ্নের জবাব কি মামুলি ব্যাপারই

www.pathagar.com

নয়? রজব আলী গাঢ়কণ্ঠে বলল, 'ঠিহ্ই কইছো। বিবিছিও অহন আগের মত নাই। দুই লম্বর অইয়া গ্যাছে। ভালা আছে আর কোন্ জিনিস? হগ্গলেতেই (সবকিছুতেই) দুই লম্বরী। ভালা যা-ও কিছু আছিলো, বুশ ব্যাটা রাজা অইয়া সব একেবারে গ্যাছে।'

এ-ভাবে অনেক সময়ব্যাপী চলল আসরের আলোচনা। তাতে কাজবাজ ফেলে অবসর বসে সকলে সাবাড় করল গাঁদা গাঁদা পান-সুপুরী আর বিড়ির বান্ডিল। সাথে হুক্কা তো আছেই।

আসরের ইতি টেনে বাড়ীমুখে রওয়ানা দিল রজব আলী।

পথিমধ্যে আবারো ডাক পড়েছে। যেতে হবে।

সেদিন পথ চলতে ঠিক এখানে এসেই চোখে পড়েছিল হাফসার মায়ের বরবটির বাগান। লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা লতানো গাছ। টসটসে তাজা ঘন-সবুজ পত্র-পল্লব। এরই ফাঁকে ঝুলে আছে বরবটিগুলো। অসাধারণ সৌন্দর্য-ভরা ফলন। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো। ক'জনের ফলে এ-রকম ফলন ! খুব আচানক লাগছিল রজব আলীর। পথে দাঁড়িয়ে গৃহকর্তীর উদ্দেশ্যে বড় আওয়াজে অনুভূতি ব্যক্ত করেছিল, 'কই গেলা গো হাফসার মা! তোমার হাফসার গাছে এত্ত সুন্দর কুচ্‌কলাই (বরবটি) ধইর্‌ছে ! খাওয়াইও গো ! নইলে তোমার কন্যা হাফসার বিয়া অইতো না কইলাম।'

হাফসার মা সেদিন শুনে লাজুক মুখে শুধু নীরব হাসি হাসছিল।

আজ গাছ থেকে বরবটি পেরে বিল থেকে মারা কইমাছ পাক করেছে হাফসার মা। 'মাষ্টর সাব' কে বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে দেখে ডাক পড়ে গেছে। বরবটির পাক খেয়ে যেতে হবে।

রজব আলী ঘরে বউপেটালেও বাইরে গেলে এলাকার লোকজনের সাগ্রহ-ভালোবাসার মেলায় এ-ভাবেই দিন কাটে তাঁর।

॥ ৪ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস চলছে।

গভীর রাত।

সারা বাড়ীর বাতাস ভারি হয়ে আছে ভিজে বাসি খড় আর নালিচা পঁচা গন্ধে। দিনে ছিল প্রচন্ড রকমের গরম। রাত গভীর হয়ে যাওয়ায় দিনের রোদের উষ্ণতা এতক্ষণে দূর হয়ে গেছে। অথই হাওড়-বিধৌত স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়া বইছে। গা জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে এই করমচা গাছের তলায়ই গা এলিয়ে শুয়ে থাকতে। কিন্তু ভবানির

www.pathagar.com

মা রাতের বিছানায় বিশ্রামে যাওয়ার কথা এখনো ভাবতে পারছে না। স্বামী রজব আলী ইতিমধ্যে বাইরে থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ভবানির মা দুপুরে ভাত খায় নি। খেয়েছিল বাথুয়া শাক দিয়ে দুটো চিতই পিঠে। তারপর সেই কখন মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শেষে দু'টো লম্বা মদন আলু চিবিয়েছিল। গলা ভিজিয়েছিল দু' গেলাস পানি খেয়ে। এতক্ষণে পেটে আর নেই কিছু। পেট চোঁ-চোঁ করছে।

অবশ্য ভবানির মা'র হাতের কাজও শেষের পথে। আর অল্প কিছু খড় আছে বাকী। কিন্তু খড়-ঝারা ধান যা বেরিয়েছে, তা দেখলে যে কারো মনে মায়া জাগবে। ধানের প্রতি মায়া। ধানও অল্প নয়। বেরিয়েছে একেবারে ভর্তি দু'টুক্‌রি। এই ধানগুলি আবর্জনা সাফ না -করে ভবানির মা ঘুমোতে যাবে না।

এই খড়-ঝারা কাজে সে লেগেছিল সন্ধ্যারাত থেকে। পুরো তিন টিলা খড় দু'হাতে ঝারতে হয়েছে গোছা গোছা করে। সবটা তাঁকে একা করতে হয়েছে। কোনো যোগালী ছাড়া। খেলাকথা না। এ-যে বাড়ীঘরের কাজ। কেবলই মহিলাদের। এ কাজ পুরুষরা করলে চলে না।

কাজ শেষ হল। ভবানির মা ক্লান্তি আর খিদের তাড়নায় অস্থির। তড়িঘড়ি করে জিনিসপত্র গুছাল। রান্নাঘরে গেল কূপি বাতিটা হাতে নিয়ে। শিকেয় তুলে রাখা পিতলের বাটির দিকে চোখ ফেলল। কিন্তু হায়! বাটি যে নেই যথাস্থানে! কোথায় গেল? কে নেবে? কেউ তো আসে নি এখানে?

বাটি পড়ে আছে নীচে মাটিতে। শুঁটকির ভর্তা সরিষার তেলে ভাঁজার পর তা দিয়ে তৈরী কুমড়ো পাতার বড়া সযত্নে রাখা ছিল এই বাটিতে। বড়াগুলো নেই। শুধু বাটিটা উল্টে পড়ে আছে। ঘরের পোষা দুষ্টু হুলো বিড়ালটার কাজ। শুঁটকি-ভাঁজা গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে বাটি ফেলে সব সাবাড় করে দিয়েছে। সতর্কতার অভাবে এমন সর্বনেশে হয়ে গেল।

শূন্য বাটিটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে ভবানির মা ক্লান্ত শরীরে হাঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। মনের কষ্টে তাঁর রাতের খাবার খাওয়া আর সম্ভব না। শুয়ে পড়ল গিয়ে বিছানায়। ভেতরে আজ আর খাবার যাবে না। গলায় আটকে যাবে। কারণ সকালে এই বড়া তৈরী করিয়েছিল দারোগা মিয়া। এর জন্যে ক'দিন ধরেই পীড়াপীড়ি করে আসছিল, তাঁর মন চাচ্ছে কুমড়ো পাতার বড়া খেতে। সকালবেলা বড়া তৈরী করে ভবানির মা ছেলেকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে ভোরে উঠে হাটে চলে গেছে। জরুরী প্রয়োজন হওয়ায় পাইকারের লোক এসে সাথে করে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

জীবন মুর্খতা কিংবা নানা মলীনতায় ঢাকা থাকলেও মানবীয় স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য লোপ পায় না। তাই ভবানির মা মাতৃত্বের সহজাত টানে অতিকাতর হয়ে পড়ায় রাতে আর কিছুই মুখে দিতে পারে নি। কিন্তু পরদিন সকালেও কি খায় নি? না । খেয়েছে। কারণ দারোগা মিয়া আগামী দু'চার দিনের মধ্যে ফেরার সম্ভাবনা কম। সামনে কুরবানীর ঈদ। গরুর বাজার চলছে সরগরম। হাট আছে একটার পর একটা।

ভবানির মা'র সংসারে প্রধান চালিকা শক্তি হল দারোগা মিয়া। গরু-বাছুর লালন-পালন থেকে শুরু করে মনপ্রাণ ঢেলে চাষবাসের খাটাখাটনি, সব সে-ই করে। তার ওপর আবার অন্য ধান্দাও আছে। ভিন্ন আরেক পেশা। গরু-দালালী। নগদ টাকা হাতানোর কারবার। কাজটা শহর-বন্দরের লোকদের জমি-দালালী, পাসপোর্ট-দালালী, থানা-দালালী, ইত্যাদির মতো হলেও যথেষ্ট ভিন্ন।

গরু-দালালীতে দারোগার হাত খুব পাকা। শহর-বন্দরের ভাষাও কিছুটা চলতে চলতে ভালোই শিখে ফেলেছে। সে মক্কেল কাবু করতে জানে। পাইকারদের কাছে তাঁর বেজায় কদর। গেরস্থি কাজের ফাঁকে সে কর্মব্যস্ত থাকে পাইকারদের সাথে। একেবারে সুদূর হবিগঞ্জ বাজার, মাধবপুর বাজার, কেশবপুর বাজার, আজিমিরিগঞ্জ বাজার, ভরার বাজার থেকে অষ্টগ্রাম আর মিঠামইন বাজার পর্যন্ত সে ঘুরে বেড়ায় পাইকারদের নিয়ে।

পাইকারের সাথে থাকার জন্যে দারোগা রোজ পায় পঞ্চাশ টাকা করে। প্রথম কাজ লাঠিয়াল হিসেবে নিরাপত্তা-রক্ষীর ভূমিকা। পাইকার সাব রাতের বেলা কমদামী হোটেল ভাড়া করে ঘুমায়। দারোগা তখন গরুর বাথান পাহারা দেয়। লোকজন অনেকে তখন তাঁকেই মালিক মনে করে। এ-কথা ভাবতে বেশ আনন্দ লাগে তাঁর। মনে আশা আছে, আল্লাহ্ চাহে তো একদিন সে নিজেও এ-রকম হাটে বাথানের মালিক হবে। পাইকার সাব হবে।

দ্বিতীয় কাজটিতে দারোগা খুবই রোমাঞ্চবোধ করে। তাতে কড়কড়ে টাকা আসে হাতে। পাইকার সাবরা যে তাঁকে সময় সময় স্মরণ করে, বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসে, সেটা তাঁর কাছে বড়ই ইজ্জতের বিষয়। এমন ইজ্জত কামাই হয়েছে এই দ্বিতীয় কাজটির কারণে।

কাজটি হল, হাটে বসে গরু বেচাবিক্রির সময় আগ্রহী ক্রেতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে গরুর দাম চড়িয়ে দেয়া। তাঁর ধান্দাবাজিতে ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়ে চড়া দামে মাল গছে ফেললে সে পায় দামের বাড়তি অংশের জন্যে প্রতি হাজারে দু'শো টাকা করে।

এ-কাজে তাঁর এ-যাবৎ কালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল গত বছর অষ্টগ্রামের

www.pathagar.com

কুরবানি হাটে। তখন ছিল পড়ন্ত বিকেল। আসরের নামাজ শেষে মানুষ মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। ভালো কাপড়-চোপড় আর তাজা চেহারা দেখে এক লোকের পিছু লেগেছে দারোগা। ওই মক্কেলকে দেখতে সরকারী লোক লাগে। একদম অফিসার সাব। গরু বাজারে অফিসার সাবদের 'সাইজ' করতে আলাদা মজা আছে। এঁরা সহজে ধরা দেয় হাসিমুখে। প্যাঁচাল করে না। দারোগা এই লোকের পিছু ছাড়ছে না।

অফিসার সাবের পেছনে আট-দশ হাত দূরে দূরে ভিড় ঠেলে হাঁটছে দারোগা। লোকটি কোথাও কোনো গরুর কাছে দাঁড়ালে সে-ও দাঁড়ায় অদূরে। লক্ষ করে ভাবগতিক। কিন্তু লোকটি বেশীক্ষণ কোথাও দাঁড়াচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ পর লোকটি এক-জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। গরুর দরদাম করছে। দারোগা পেছন থেকে লোকটির বক্তব্যের সাথে সুর মেলাল। মৃদু তর্কও জুড়ে দিল বিক্রেতার সাথে। তারপর তাঁর পাইকারের বাথানের দিকে হাত ইশারা দিয়ে বলল, 'আরে ওইখানে যে সুন্দর গরু উঠেছে, তাঁরা তো আপনার মতো এত গলাকাটা দাম চায় নি। আমার টাকায় কুলাচ্ছে না। না-হয় আমি ওই গরু না-নিয়ে ছাড়তাম না।'

কিছু জায়গা হাঁটার পরই অফিসার সাব দারোগার পাইকারের কাছে উপস্থিত।

লোকটি একে-একে কয়েকটি গরু হাত বুলিয়ে দেখলেন। জানতে চাইলেন, 'কোনটার দাম কত?'

দারোগার পাইকার সাব হাতকচলে কাঁচুমাচুভাব করে বলল, 'আপনে অইলেন অবিচার মানুষ। আপ্‌নের কাছ থেইক্যা বেশী রাইখ্‌লে অইবু? কোনটা লাগে লইয়া লন।'

লোকটি হাত দিয়ে নির্দেশ করলেন তাঁর পছন্দলাগা গরু। জানতে চাইলেন,"কত টাকা?'

পাইকার এতক্ষণ লোকজনের কাছে দশ হাজার টাকা দাম চেয়েছে। কিন্তু উনি অফিসার মানুষ। দারোগার মক্কেলও। কাজেই বাড়িয়েই বলতে হবে। সে গাঁইগুঁই ভাব করে বলল, 'বেশী না। এক্কেরে কম ট্যাহা। মাত্র পনের আজার (হাজার)'।

লোকটির পছন্দ হয়েছে গরু। তিনি বললেন, 'না। একটু কমিয়ে-সমিয়ে বলেন।'

ঃ আপনেই বলেন স্যার।

ঃ দশ হাজার টাকা দিব। হলে দিয়ে দেন।

ঃ জ্বি না। পাইর্‌ছিনা। মাফ করেন।

দূরে দাঁড়িয়ে দারোগা সব নজরদারী করে যাচ্ছিল। যখন দেখা গেল মক্কেল ফসকে যাচ্ছে, অমনি চট্ করে দু'জনের মাঝখানে এসে হাজির হল সে। ক্রেতা

www.pathagar.com

সেজে তাঁর পাইকারকে বলল, 'আপনের এই গরুটা তো খুব চমৎকার! কত বেইচ্‌বেন ভাই?'

ঃ পনের হাজার টাকা অইলে দিয়া দিবাম।

ঃ একদামে বেচাবিক্রি অয় না। এক্কেরে সাফকথা কইয়া দেন দেহি। অইলে নিয়া যাইবাম।

ঃ কম দিতে চাইন? পাঁচ শ ট্যাহা কম দিয়া দ্যাইন।

ঃ আরে না। যা মুহে আয় কইলে অয় না। এক্কেরে এককথা, তের আজার ট্যাহা অইলে আছি।

ঃ না ভাই। পাইর্‌বাম না। যা কইলেন, তা আমার কিনা দরও অইছে না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার সাবের ধারণা জাগল, এ-গরু দশ হাজার কেন, তেরো হাজারেও বিক্রি হচ্ছে না। তাহলে এর সঠিক দাম কত বলা যেতে পারে? নিশ্চয়ই চোদ্দো হাজার। আর দেরী না-করে তিনি ঝটপট বলে ফেললেন, 'দেন ভাই দেন। চোদ্দো হাজার টাকা দিব।'

সেদিনকার অফিসার সাবকে 'সাইজ' করার মতো ঘটনা হাট-বাজারে খুব কমই ঘটে। মক্কেলকে এত সহজে বেশী চড়ানো যায় না সাধারণত। ওইদিন দারোগা পেয়েছিল বারো শো টাকা। তার মানে তাঁর মক্কেল অফিসার সাবকে 'সাইজ' করেছিল একেবারে ঝারা ছয় হাজার টাকা।

এ-ভাবেই ক্রেতাকে কৌশলে বিভ্রান্ত করে টাকা রোজগার করে দারোগা মিয়া। অবশ্য এ-পর্যন্তই শেষ নয়। কাজের কৌশল তাঁর অনেক প্রকারের। চেনা-পরিচয় লোকদের মধ্যে থেকে ক্রেতা এলে দারোগা অন্যপন্থা অবলম্বন করে। কথা হচ্ছে শুধু ক্রেতা লোকটি চোখফোটা কেউ না- হলেই হয়। দারোগা তখন কাছে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ক্রেতার পরামর্শদাতা সেজে যাবে। সম্ভব হলে ক্রেতার সাথে কথা পাকাপাকি করে নেবে, 'আপনেকে হগগল থেইক্যা কম দরে ভালা গরু কিনাইয়্যা দিবাম। আমারে বেশী না, এক শ ট্যাহা মন চাইলে দিয়েন।' ক্রেতা রাজি হলে তাঁকে তাঁর পাইকারের কাছে নিয়ে আসবে। পাইকারের সাথে তাঁর যোগ-সাজশ কিংবা পরিচয়ের লেশমাত্রও বুঝতে দেবে না ক্রেতাকে। বরং পাইকারের সাথে তখন চটাচটা কথা বলবে। দেখলে মনে হবে পাইকারের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করেই বুঝি গরু কম দরে নিয়ে যাবে। অপরদিকে ক্রেতার সাথে আলাপ করবে আপনজনের মতো। এ-ভাবে ভেল্কিবাজি সৃষ্টি করে ক্রেতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাধ্য করবে চড়া দামে কিনতে। এতে দারোগা মিয়ার দু'দিকেই লাভ। ক্রেতার কাছ থেকে চাহিত বখশিশটা

www.pathagar.com

পাইকারকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলবে, 'উস্তাদ ! হালারে সাইজটা ঠিকমতোই করলাম।' পাইকারের কাছ থেকে পাওনা বুঝে নেবে রাতেরবেলা বেচাবিক্রি শেষ করে।

এই দালালীকর্ম সুচারুরূপে চালাতে গিয়ে দারোগা মিয়ার আবার খরচাপাতিও আছে। কারণ প্রত্যেক হাটেই মক্কেল সম্পর্কে খোঁজখবর দেয়ার জন্য কিছু স্থানীয় লোকের দরকার হয়। এরা দালালের চর হিসেবে সারা হাটে ঘুরে বেড়ায় টইটই করে। হাটের বিশাল জমায়েতে সব লোক মক্কেল নয়। তাই আসল মক্কেল বের করে চিনে রাখে তাঁরা। তারপর দারোগা মিয়াকে দূর থেকে ইশারা করে চিনিয়ে দেয়।

এ-ধরনের তথ্য দেয়ার বিনিময়ে চরদের দিতে হয় প্রতি মক্কেল পিছু পঞ্চাশ টাকা করে। তবে মক্কেল যদি সাইজ না-হয়, তবে চরেরা কিছু পায় না। পাল্টা পাইকারের ধমক খেতে হয়, 'কি মক্কেল আইন্ ছোত ((এনেছিস) ব্যাটা সাইজ অইলোনা।'

এ-ভাবেই চলে দারোগা মিয়ার গরু-দালালী। হাট করা শেষে দু'দিন-তিন দিন পরে বাড়ী ফেরে কোমরে বাঁধা থলিতে কয়েক শো টাকা নিয়ে।

এবার হাটে যাওয়ার পর ফিরতে দেরী হচ্ছে কুরবানী মওসুম হওয়ায়। চার দিন হয়ে গেল। দারোগা মিয়া ফিরছে না। ভবানির মা সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত মুখে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভাবানির মা মান্নত করল। শিরণী দেবে। একজোড়া মোমবাতি আর পাঁচটা টাকা দেবে মালিকের দরগায়। তাঁর পেটের ধন সহিসালামতে যেন বুকে ফিরে আসে। আল্লাহ্ যেন রহমত করেন।

এলাকার সকল মানুষদের ন্যায় ভবানির মাও অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পোষণ করে মালিকের দরগার প্রতি। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত তিন বুযুর্গের কৃতিত্বধন্য কর্মকান্ডের কথা ভবানির মা কম-বেশী জানে। কিন্তু জানে না এ-বুযুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের সঠিক নিয়মনীতি। তাঁর পাঠানো মোমবাতি হয়তো আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু টাকা যে দেবে পাঁচটা, তা কি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় হবে? না কোনো স্বার্থপর ধোঁকাবাজের পকেটে যাবে? এ-কথা জানে না ভবানির মা।

রজব আলী ধনু মেম্বারের সাথে মিঠামইন গেছে। আগামীকাল আসবে। এলে পরেই স্বামীকে পরদিন বৃহস্পতিবার দরগাহে পাঠাবে। মনস্থ করল ভবানির মা।

অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে আজ শুক্রবার। কিন্তু স্বামী আসার খবর নেই। দারোগা মিয়ার চিন্তায় ভবানির মা অস্থির হয়ে উঠল। আজ সারা দিন একফোঁটা পানি পর্যন্ত মুখে দেয়নি।

www.pathagar.com

বিকেলবেলা। ভবানির মা মিঠা কদুর মাচানের নীচে গালে হাত দিয়ে বসে বাড়ীর ঘাটলার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ একটা নৌকো এসে থামল। কিন্তু না। দারোগা মিয়া না। স্বামী রজব আলী এসেছে।

রজব আলী ঘরে গিয়ে পরনের আধ ময়লা প্যান্ট পাল্টিয়ে লুঙ্গী পরল। খুলে রাখল চশমা আর ঘড়ি। কাঁধে একটা চিটচিটে গামছা ঝুলিয়ে খাবার খেতে গেল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই! আশ্চর্য ! স্ত্রী ভবানির মা কোথায়? রজব আলী ভুরু কপালে তুলে কড়া চোখে এ-দিক থেকে ও-দিক তাকাতে লাগল। কর্কশ সুরে হুংকার দিয়ে ডাক ছুড়ল,' এ্যাই ! তুই কই? আমি আইছি তোর খবর নাই? গায়ে লাগে না?'

কোনো সাড়া নেই। শোকাহত ভবানির মা মাচানের নীচে বসে শুনছে। কিন্তু জবাব দিচ্ছে না। জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। এমন পাষাণ মানুষের জবাব দিয়ে কী হবে? পাষাণ না-হলে এতদিন ধরে মেম্বারের চামচেগিরিতে পড়ে আছে বাড়ীর বাইরে? একবারও কি ভেবে দেখেছে নিজপুত্র বাড়ী ফিরল কি না?

রজব আলী ঘরের বাইরে এল। লাঠি খুঁজতে লাগল। ভবানির মাকে যেখানেই পাওয়া যাবে, একচোট উত্তম-মধ্যম দিতে হবে। ঘরে তাঁর মন টেকে না। নিশ্চয় ট্যাং-ট্যাং করতে বেরিয়ে গেছে পাড়ার সই-সখিদের কাছে। লম্বা গপে মেতে উঠেছে। স্বামী বাড়ী আসবে, এই চিন্তা তাঁর মাথায় নেই।

দেউড়ীর পাশে চুলোর কাছে লাকড়ীর গাঁদা। সেখান থেকে হাত-দেড়েক লম্বা একটা মরা ডাল হাতে নিয়ে রজব আলী খুঁজতে লাগল ভবানির মাকে।

হাতের ডাল দিয়ে রজব আলী এটা-সেটায় ঠাস-ঠুস বাড়ি দিচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'এ্যাই! তুই কই? কই গেলি লো আলাতুনি?'

পায়চারী করে একটু ডান দিকে মোড় দিতেই দেখে ফেলল, তাঁর কাংখিত লক্ষ্যবস্তুটি কদু মাচানের নীচে। মাটিতে ঝিম মেরে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। ব্যস, আর যায় কই? তেড়ে এসে ঝাপটে ধরল ভবানির মাকে। বাম হাতে চুল খাবলে ধরে ডান হাতে চালাল এলোপাতাড়ি বাড়ি।

ভবানির মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। কান্না থামিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান ধরে উবুর হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর পর শুধু নিস্তেজ শরীর থেকে মৃদু গেঙানোর শব্দ আসছে।

রজব আলী বেকুব বনে গেল। নীরবে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে রইল, ভবানির মা উঠে বসে কি না। কিন্তু সে সামান্য নড়াচড়াও করছে না। অপেক্ষা করার পর রজব আলী বকবক করতে করতে ভবানির মা'র বাহুতে ধাক্কাতে শুরু করল, 'এ্যাই !

www.pathagar.com

এ্যাই! তোর লড়াচড়ি নাই ক্যা? কথা ক। এ্যাই! কথা ক। মইরা গেলি নাহি? এ্যা?.....।'

কোনো সাড়া নেই। লাশের মতো পড়ে আছে শরীরটা।

রজব আলী ভয় পেয়ে গেল। জীবনে কোনো দিন তাঁকে মারখেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে দেখা যায়নি। আজই কেবল এরকম ঘটল। সেটাই রজব আলীর ভয় পাওয়ার কারণ।

রজব আলী হতভম্ব হয়ে দৌড় দিল। মাটির কলসী আছে রান্না ঘরে। কলসী দিয়ে বিলের ঘাটলা থেকে পানি এনে ভবানির মা'র মাথায় ঢালবে।

পানির কলসী কাঁধে বেহুশের মতো আসতে লাগল রজব আলী। হাঁকিয়ে হাঁটার কারণে কলসীর পানি উপচিয়ে পড়ে সারা শরীর তাঁর ভিজে যাচ্ছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় হাঁফাতে হাঁফাতে বুক থেকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু হায় ! সর্বনেশে কান্ড! ভবানির মা এখানে নেই! গেল কই? অজ্ঞান-অচেতন মানুষ এখান থেকে যাবে কেমন করে? ঘটনা কি? রজব আলী চোখে অন্ধকার দেখছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভূতের কারবার ছাড়া আর কিছু নয়। ভূতে নিয়ে গেছে ভবানির মাকে। সুন্দরী মহিলাদের প্রতি ভূতেরও একটা নজর থাকে। আতংকে রজব আলীর হাত-পা পেটের ভেতর যাওয়ার জোগাড়। কাঁধ থেকে পানির কলসী ধপাস করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। মাথায় হাত দিয়ে ঝপ করে বসে পড়ল কদুমাচানের নীচে মাটিতে।

কতক্ষণ পর উঠে রজব আলী বাড়ীর সবক'টি ঝাকরানো গাছের ডালের আড়ালগুলো খুব গভীরভাবে দেখতে লাগল। ঝোপঝাড় বাদ রাখল না কিছুই। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সবকিছু পরিস্কার দেখাও যাচ্ছিল না। পাত্তা নেই কোথাও।

কাউকে কিছু না-বলে রজব আলী ঘাটে বাঁধা নিজের ছোট ডিঙি নৌকোটি নিয়ে রওয়ানা দিল বৈদ্যবাড়ীর কনার কাছে। ঝপাঝপ বৈঠা মারতে মারতে বেহুশ হয়ে ছুটে চলল অন্ধকার হাতড়ে। কনাবৈদ্যা মানুষের হাত গুনে। বাটি চালান, আয়না, পড়া, চাউল পড়া-সব তাঁর জানা। বেশী বুড়িয়ে যাওয়ায় চোখে দেখে কম। তবু যে-কারো হাত দেখে তর তর করে বলে দেবে অতীত ও ভবিষ্যত। অনেক বড় বড় দৈত্য-দানব তাঁর তাবে করা আছে। ডাক দিলে তাঁরা আসে। কনা তাঁদের সাথে তান্ত্রিক ভাষায় কথা বলে।

সন্ধ্যা রাত। বৈদ্যা রজব আলীকে নিয়ে গেল তাঁর বাড়ীর ঈশান কোণে একটা শ্যাঁওড়া গাছের ঝুপড়ির নীচে। গাঢ় অন্ধকার-ঢাকা নীরব-নিস্তব্ধ এক ভূতুড়ে জায়গা।

www.pathagar.com

মানুষ দূরের কথা পশুপাখীও কোনো দিন আসে না মনে হয় এদিকে। পোঁকামাকড়ের নড়াচড়া পর্যন্ত নেই। চারদিকময় ছড়িয়ে আছে কাঁচা গোবরের উৎকট গন্ধ। রজব আলীর নাড়িভুঁড়ি পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

নীচে স্যাঁতস্যাঁতে মাটি। তাতে শেওলাপড়া একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল কনা বৈদ্যা। হাতে একটা কূপি বাতি। টিম টিম করে জ্বলছে। মাটিতে হাতের নখ দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে অনেকগুলো দাগ টানল। তারপর দু'চোখ বুজে অংমংচং করে কার সাথে যেন বেশ সময় ধরে বাক্যালাপ করল। পরে খানিক ধ্যানমগ্ন থেকে চোখ খুলে বলল, 'তোর বউ ভূতে নিয়া গ্যাছে। চান্নি রাইত (চাঁদনী রাত) না-আইলে কইতে পারবাম না কিছু। ভূতে ব্যাটিরে লইয়া হুলামেলা করতাছে (আনন্দ-উল্লাস করছে)। তুই আভাগ্যা (হতভাগা) কান্দিছ না।'

ঃ মশাই ! অহন উপায় অইবু কি?

ঃ চিন্তা নাই। ঢেঙ্গা দানব, মাথাকাটা দানব, আঠাইল্যা দৈত্য, দাঁতাইল্যা রাক্ষস-হগ্‌গল মিয়ারে জানাইছি। কাইল (আগামীকাল) ডাঙ্গর একখান গাভীন গাই (বড় একটা গর্ভবতী গাভী), একজোড়া কালা কইতর (কালো কবুতর), একদামে কিনা (ক্রয় করা) একখান পাতিল আর নয়টা কাঁছা ট্যাহা (কাঁচা টাকা/ধাতব মুদ্রা) লইয়া আইবি।'

রজব আলী থ হয়ে বসে রইল। বৈদ্যা অভয় দিয়ে বলল, 'তিন দিন-তিন রাইত বার চাহার পর (অপেক্ষা করার পর) ফল পাইবি। আইজ ভট ভাইঙ্গা কউন যাইবো না (আজ গোপনীয়তা ফাঁস করে বলা যাবে না।) নিষেধ আছে। চইল্যা যা।'

রজব আলী বিষন্ন মনে বাড়ী রওয়ানা দিল। দীর্ঘ রাত করে বাড়ী এসে পৌঁছাল। কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্যের বিষয়! ঘরে ভবানির মা'র গলার আওয়াজ শোনা যায় ! এ কেমন করে সম্ভব? বিস্ময়ে রজব আলীর গা শির শির করে উঠল।

আজ দিনের বেলা কদু মাচানের নীচে পিটুনি খেয়ে ভবানির মা লুটিয়ে পড়লে রজব আলী যখন দৌড়ে কলসী নিয়ে পানি আনতে গিয়েছিল, ভবানির মা তখন সটকে পড়ছিল। স্বামীর ভয়ে আত্মগোপন করেছিল তাঁর চৌচালা ঘরের পেছনে পাটখড়ির গাঁদার নীচে। রজব আলী সেটা বুঝে উঠতে না-পারায় ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যায়।

রজব আলী নিশ্চিত হয়ে স্বস্থিবোধ করার জন্য গুটিগুটি পায়ে দরোজার কেওয়াড়ের ফাঁকে উঁকি দিল। ভালোমতো কান পেতে শুনল, ঠিকই আছে। ভবানির মা'র গলাই। যাক বাঁচা গেল। না- হয় আগামীকাল এতগুলো জিনিসপত্র নিয়ে বৈদ্যার বাড়ীতে যেতে হত। বিস্তর খরচাপাতির ব্যাপার।

www.pathagar.com

তবু কেন জানি বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না রজব আলীর। কিন্তু কথা তো পরিস্কারই শোনা যাচ্ছে। সন্দেহ করার মতো কিছুই নেই। ভবানির মা ছোটছেলে ঝাড়ু মিয়াকে বলছে, 'তোর বাপের কথা আর কইচ্না (বলিস না)। কাইল রে বাপ তুইই যাবি মালিকের দরগায়। ধানকাটা-কাম পইড়া থাউক (পড়ে থাক)। ভাত না-অয় না-খাইবাম।'

ঝাড়ু মিয়া যেতে চাচ্ছে আরো কয়টা দিন পর, আষাঢ় মাস এলে। তখন গেরস্থি কাজবাজ থাকবে না কিছু। দিন কাটবে অবসরে। এলাকায় ঘুরোঘুরি করে। তখন কাজের কাজ শুধু গরু-বাছুর তত্ত্ব-তালাফী করা। আর বসে বসে কটিখেইল খেলা, মাছমারা, না-হয় বাইনকাটি (বাঁশ-বেঁতের জিনিসপত্র) বানানো- এ সব করেই তখন সময় কাটে।

কিন্তু এখন বিলে পাকা ধান মজে যাচ্ছে। সময়মতো কেটে না-আনলে পঁচে লাদ হবে। কোনো কোনো বৎসর এই ধানকাটা বৈশাখের শেষাশেষিতেই সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এবার বিলম্বিত ফলন হয়েছে। ধানকাটা শেষ করতে জ্যৈষ্ঠ মাস পুরোটা লেগে যাবে।

একে তো গেল এ-অবস্থা। তার ওপর আবার 'মাইঝ্যা ভাই' দারোগা মিয়া বাড়ী নেই। একজনমাত্র দাওয়াল, তাঁকে নিয়েই ধানকাটা, নৌকো-বোঝাই করা, বাড়ী এনে খলায় ফেলা- সকল কাজ করতে হচ্ছে ঝাড়ু মিয়াকে।

কত নেশা ঝাড়ু মিয়ার কুড়া শিকারের। বছরের এই সময়টাতে বৃষ্টি-বাদলের পর পরই কুড়াপাখী সঙ্গী খুঁজতে গিয়ে শিকারীর ফাঁদে ধরা দেয়। ভোরবেলা বোরো ধানের গহীন ঝোপের মধ্যিখানে নিজের পোষা কুড়া নিয়ে ফাঁদ পেতে বসে অপেক্ষা করতে কত আনন্দ ঝাড়ু মিয়ার ! লোকে বলে জাড়ু মিয়ার নাকি কুড়া রাশি। সে শিকারে গেলে কুড়া না-নিয়ে ফেরে না। সেই কুড়া শিকারে পর্যন্ত যেতে পারছে না একমাত্র সময়ের অভাবে। এখন মায়ের কথা রক্ষা করতে যেতে হবে সেই অষ্টগ্রামের ঘাগড়া নামক স্থানে। যেখানে মালিকের দরগাহ্। একেবারে দিনমানের পাড়ি।

এখন উপায়? বড় ছেলে জজ মিয়ার কথা ভাবছে না ভবানির মা। সে একটু হাবাগোবা। তবে সংসারী আছে ঠিকই। কিন্তু কথা বলতে তোতলায়। মাস কয়েক হল তাঁকে বিয়ে করানো হয়েছে। বউটা জবর দুষ্ট। সে জজ মিয়াকে প্ররোচণা দিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে পৃথক করে নিয়ে গেছে। তাঁকে কিছু বলতে আগ্রহী না ভবানির মা।

বাইরে দাঁড়িয়ে রজব আলী ঘরের ভেতরের আলোচিত সকল বিষয় বুঝতে না-পারলেও একটি কথা বুঝতে অসুবিধে হয় নি, ভবানির মা ঝাড়ু মিয়াকে গেরস্থি কাজ

www.pathagar.com

ফেলে রেখে আগামীকাল কোথায় জানি পাঠাতে চাচ্ছে। রাগে রজব আলীর পিত্তি জ্বলে উঠল। তেড়েফুঁড়ে এসে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে খস্‌খসে গলায় জানতে চাইল, 'এ্যাই বান্দি! ধানকাটা-কাম থুইয়্যা আমার পোলা তুই পাঠাবি কই?'

কথা না-বাড়িয়ে ভবানির মা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, আগামীকাল আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে নিজেই যাবে অষ্টগ্রামের ঘাগড়ায় মালিকের দরগায়।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকাল বেলা।

নীরবে ভবানির মা প্রস্তুতি নিল। একজোড়া মোমবাতি লইল। চারটা দশ টাকা নোট পরনের রঙ-মরা শাড়ির আঁচলের কোণায় গিঁট বেঁধে নিল। পাঁচ টাকা দেবে শিরণী। পাঁচ টাকা পথে বিড়ি কেনার জন্যে। কারণ তাঁর আবার কতক্ষণ পর পর বিড়ি টানতে হয়। ছোটবেলার অভ্যেস। বাকী তিরিশ টাকার মধ্যে বিশ টাকা যাবে আসা-যাওয়ার নৌকো ভাড়া। দশ টাকা বাড়তি থাকবে বিপদের বন্ধু। যদি দরকার লাগে। ছোট করে বোঁচকা বেঁধে লইল পানের ডিবা। বুকের কাপড়ের কোঁচড়ে গোটা পাঁচেক ঢাকনা পিঠে। দুপুর বেলা খিদে লাগলে খাবে।

সকালের সূর্য আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। মাঝ উঠোন পর্যন্ত এসে গেছে ছায়া। ভবানির মা অস্থির হয়ে মনে মনে অপেক্ষা করছে স্বামী কখন বেরিয়ে যায়।

রজব আলী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল, 'সব্বোনাশা! দশটার উপরে বাইজ্যা গেছে। বেইলের আইলসা নাই' (বেলার আলসেমো নেই)। সে তড়িঘড়ি করে কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে গেল প্রতিদিনকার মতো।

রজব আলী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই ভবানির মা আলগোছে বেরিয়ে পড়ল। পাশের বাড়ীর সফর বানুকে ধরল সাথে যাওয়ার জন্যে। কারণ রাস্তাঘাট সম্পর্কে ওই বেটির আবার জানাশোনা ভালো। কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না যেতে। এই কয়দিন ধরে বেচারীর রাতের ঘুম কামাই যাচ্ছে মাথার উকুন পালের যন্ত্রণায়। মনে মনে খেয়াল করে রেখেছে, আজ কাজকামের ঝামেলা একটু কম। তাই সাধ মিটিয়ে সারাটা দিন উকুন বাছাবে মাথার।

কিন্তু ভবানির মা যে হড়কে যাওয়ার আদমী না। নানা কিছু বলে ধরে বেঁধে শেষপর্যন্ত রাজি করল সফর বানুকে। দু'জনে ফিসির ফিসির কথা বলতে বলতে হনহন করে হেঁটে জাইল্যাবাড়ীর ঘাটে পৌছাল। ওদিকেই চলাচল করে মালিকের

www.pathagar.com

দরগায় যাওয়ার নৌকো।

দেখতে দেখতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য মেঘের আড়ালে। চোখ ঝলসানো রোদ ফিকে হয়ে আসছে কালো মেঘের আঁবছায়ায়। মৃদু একটা বাতাস বইছে। এখন আবার টিপটিপানি বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ছাতা নেই একজনেরও। একটা কলাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে দু'জন জড়াজড়ি করে ধরে আড়ষ্ট হয়ে হাওড়ের দিকে চেয়ে আছে নৌকোর অপেক্ষায়।

বেশ সময় হয়ে গেল। নৌকো আসছে না। বৃষ্টিটাও তার টিপটিপানি ক্ষান্ত দিচ্ছে না। ভবানির মা'র মনে উদ্বেগ জেগে উঠছে, বৃষ্টি যদি এইভাবে চলতেই থাকে! কিংবা আরো বেড়ে যায় ! তখন সফর বানু যদি যাবে না বলে বেঁকে বসে! হায়!

সফর বানু দাঁড়িয়ে কতক্ষণ পর পর নখ দিয়ে চুল খিজলাচ্ছে। আর মুখ খিঁচিয়ে বলছে 'উকুনের জ্বালা গো ভইন! দারুণ উকুনের জ্বালা!' তাতে ভবানির মা'র মনে উদ্বেগ আরো বেড়ে চলেছে, কী যে মুশকিল! এখন আবার উকুনের যন্ত্রণা! সফর বানু এমনিতেই খুঁত খুঁতে মনের বেটি। উঠতে-বসতে সকল কাজে উফর-ফাঁফর করে। তাঁর মর্জি-মেজাজের নেই ধারা-দিশে। কখন জানি বলেই বসে, 'আমি আর পাইর্‌লাম না। তোর যাওয়া তুই যা। আমি আগে বাইতে (বাড়ীতে) গিয়া মাথা বাছাই লই।'

খোদার মর্জি বোঝা ভার। একটা নৌকো আসছে। ভটভট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে নৌকোর ভেতর থেকে সেঁউতি দিয়ে পানি সেচা হচ্ছে। মনে হয় নৌকোটি দূর কোথা থেকে এসেছে। সেজন্যেই পানি সেচে ফিরতে হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে, এই নৌকো করেই দারোগা মিয়া সহিসালামতে এসে হাসতে হাসতে পার রাখছে ঘাটলায়। তখন আশ্চর্য হয়ে বলবে নিশ্চয়, মা! তুমি এখানে!

ভবানির মা'র অবচেতন মনে দোল খাওয়া জল্পনা-কল্পনা শেষ হতে চায় না। দারোগা মিয়া যদি এই নৌকোতে এসে পড়ে, তাহলে বলবে, মা! তুমি কেমন জানি বেঁকে-চুরে আছ কেন? বাবা মেরেছিল? তোমার গায়ে-হাতে ধুলো-ময়লা কেন? কিংবা তুমি কি আমার চিন্তায় ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া কর নি?

ঘাটলায় এসে ভিড়ল নৌকোটা। ভবানির মা'র অনুমান বৃথা যায়নি। সে দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলেছে, দারোগা মিয়া এসে নামছে নৌকো থেকে। খনকারবাড়ীর লোকও সাথে। আসমতুল্লাহ খন্দকারের নাতী জমশেদ আলম খন্দকার।

জমশেদ সাহেব ঢাকার একটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গ্রামে আসেন কম। প্রায় বছর-পাঁচেক পর এবার কুরবানী-ছুটি উপলক্ষে কয়েকদিন হল গ্রামের বাড়ী এসেছেন। সাথে ঢাকাইয়া বন্ধু সাঈদ আনোয়ার। তিনিও

www.pathagar.com

প্রফেসর। প্রত্নতত্ত্বের ওপর ডক্টরেট করেছেন। বয়স চল্লিশের মতো না-হয় বড়জোর পয়তাল্লিশ হবে।

সাঈদ সাহেব ঢাকায় শুনেছেন, কিছুদিন আগে এই অবহেলিত অগাধ ভাটি অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক আজব কান্ড ঘটেছে। ব্যাপারটা প্রকৌশল-বিদ্যার এক নতুন সংযোজন বলেও খ্যাতি পেয়েছে। যা শুধু বাংলাদেশেরই নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসেও নাকি এক বিরল নজির। আমাদের দেশের সোনার ছেলেদের এ অসাধারণ কৃতিত্ব নিজ চোখে অবলোকন করে গর্বের নিঃশ্বাস নিতে এসেছেন তিনি।

আজব সে-জিনিসটা হল এখানকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনপদে অভিনব কায়দায় নির্মিত এক রাস্তা। বাৎসরিক পালাক্রম অনুসারে এর ওপর দিয়ে রিক্সা, টেম্পো আর অন্যান্য নানা যানবাহন যেমন চলে, তেমনি পাল-তোলা নৌকো-কার্গোও চলে সমানে। বিস্ময়ের অবধি থাকে? রূপকথার কাহিনীতেও কেউ কোনো দিন শুনেছে এমন রাস্তার কথা?

আজব এই রাস্তার নাম ডুবো-সড়ক। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Submersible Road. গভীর পানির নীচে টিকে থাকার মতো বিশেষ এক কারিগরি প্রক্রিয়ায় এটি তৈরী।

বর্ষাকালে অগাধ পানিতে হাওড় যখন বিশাল এক অকূল সমুদ্র হয়ে ওঠে, ধুমসে চলে তখন মাস্তুলে পাল তোলা যাত্রীবাহী নৌকো। মালবাহী কার্গো। জীবনযাত্রা তখন সচল থাকে। এসময় সড়কের আর কী ই বা এমন দরকার পড়ে? কিন্তু শীত আসার পর? সমুদ্ররূপী হাওড় যে তখন পানি শুকিয়ে কাঠ। জায়গায় জায়গায় নালা-নর্দমা, কাঁদা-ময়লা আর না-হয় আগাছা- আবর্জনা। সাপখোপ আর কাঁটা-কন্টক তো আছেই। পানিবিহীন হাওড় তখন এক দুর্গম ভূ-পৃষ্ঠ। মানুষকে তবু জীবন জীবিকার তাগিদে ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হয়। বেদম হাঁটা। মাইলের পর মাইল, ভোর থেকে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা থেকে কত রাত! সে-যে কী দুর্ভোগ! ঝুঁকি আর আতংকও যে কত! ডাক্তারের কাছে যেতে হলে ওই দুর্গম ভূ-পৃষ্ঠ পায়ে হেঁটে যেতে আর আসতেই কারবার সাড়া হয়ে পড়ে কত! কত রোগী অন্যের কাঁধে বাঁখারিতে ঝোলানো তক্তায় শুয়ে মাঝ-হাওড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়! গাইনীর কাছে যাওয়ার পথে কত গর্ভবতী বাচ্চা প্রসব করে। এ-অবস্থায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক চলতে পারে বাপের সাধ্যি আছে কারো?

কিন্তু না। এখন সে-অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পানি নেই-নৌকো নেই তো কী হল? ডুবো-সড়ক আছে না? সে-যে রিক্সা, টেম্পোসহ নানা যানবাহন নিয়ে হাজির। ডুবো-সড়কের কল্যাণে এখানকার জীবনযাত্রা বর্ষাকালের মতো শীতকালেও সচল, স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম ডুবো-সড়কটি বছরকয় আগে কিশোরগঞ্জের ইটনা থেকে ওইদিকে হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছিল। লম্বা সাত কি.মি.। তাতে প্রমাণিত হল আশাতীত সাফল্য। ব্যস, বিশ্ব-ইতিহাসে এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল ডুবো -সড়কের যাত্রা। সমগ্র ভাটি অঞ্চলজুড়ে এ-নিয়ে সাড়া পড়ে যেতেও বিলম্ব হল না। দিকে দিকে চটাচট শুরু হয়ে গেল নানা আয়োজন। ডুবো-সড়ক তৈরী হল মিঠামইনে। অষ্টগ্রামে। তারপর নিকলি, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট-আরো নানা জায়গায়।

এই ডুবো-সড়ক নিজ চোখে দেখার আগ্রহ সাঈদ সাহেবের বেশদিন থেকেই। আসি-আসি করেও ব্যস্ততার কারণে আসা হচ্ছিল না। প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন বলেই হয়তো পুরাকীর্তি, স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলী-এসবকিছুর প্রতি তাঁর ঝোঁক বেশী।

গ্রামে আসার পর থেকে এই কয়দিন ধরেই দু'জনে ডিঙি আর মাঝি ভাড়া করে হাওড়-বিল টই টই করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুব ভালো লাগছে তাঁদের গ্রামের মানুষ, প্রকৃতি-পরিবেশ- সবকিছু। পানিতে মানুষ হাঁসের মতো ভেসে স্পীডবোটের মতো দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়ানোর যদি কোনো ব্যবস্থা থাকত, তবেই নাকি সবচেয়ে আনন্দ হত। আর ঢাকা শহরে আজকাল যে অবস্থা ! যানজট, শহরমুখি জীবনযাত্রার প্রকোপ বৃদ্ধি- সর্বোপরি শহুরে জীবনের যান্ত্রিকতার ধকল, সব মিলিয়ে জীবন বড় দুর্বিষহ। স্বস্থি নামক ব্যাপারটা কোথায় জানি হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। শহরে জমশেদ সাহেবকে সর্বক্ষণ এক অদৃশ্য কুস্তি লড়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বাসায় নর্তকী স্ত্রীর উতলা-চঞ্চল মন নিয়ে কুস্তি। হাল আমলের ফিল্মী ফ্যাশনের পুত্রকণ্যাদের মানুষ করতে শাসিয়ে নিয়ন্ত্রণে কুস্তি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার সাথে কুস্তি। কেনাকাটায় গেলে দরদামে ঠকা-জেতার কুস্তি। যানবাহনে চড়তে ভিড়ের সাথে কুস্তি। চলতে-ফিরতে নিরাপত্তাহীনতার আতংকের সাথে কুস্তি। সবশেষে রাতের বেলা ঘুম না-এলে ওষুধ খেয়ে জোর করে ঘুম আনতে হয়। এ-ও আরেক কুস্তি ঘুমের সাথে। কুস্তির আর শেষ নেই।

আর গ্রামে? না। এখানে যদিও মুর্খতার অন্ধকার বেশী। জনপদগুলি জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতির মূল স্রোত থেকে বঞ্চিত। কিন্তু শহুরে জীবনের মতো নাকি কুস্তি নেই। জমশেদ সাহেবের কাছে সবকিছু নির্মল ও স্বস্থিদায়ক লাগছে। রাতের ঘুম ভালোমতো হচ্ছে। গতকাল অষ্টগ্রাম গিয়েছিলেন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে। ওখানে ডুবোসড়ক নামক আজব জিনিসটা আছে। অষ্টগ্রাম থেকে শুরু হয়েছে, গহীন হাওড়ের বুক চিরে পৌছেছে একেবারে সুদূর ইকুরদিয়া পর্যন্ত। সেটা দেখার পর আজ ফিরছেন।

www.pathagar.com

ফেরার পথে নৌকোতে উঠেই দেখেন গেরামের রজব আলীর পোলা দারোগাও উঠেছে। সে নৌকোর আধভেজা পাটাতনে বসে চুঁ-চুঁ করে বিড়ি টানছে।

দারোগাকে দেখামাত্র জমশেদ সাহেবের মনটা কেমন জানি কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। পরশুদিন গরুহাটে কুরবানী-গরু কেনার সময় রজব আলীর এই পোলা এলাকার লোক বলে কাছে ভিড়েছিল। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছিল। দরদী সেজে গায়ে পড়ে সহযোগিতা করেছিল গরু কেনায়। তাঁর মধ্যস্থতায় বাইশ হাজার টাকা দিয়ে গরু কেনা হয়েছিল। পরে জানা গেল চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা গচ্ছা খেয়েছেন। রজব আলীর পোলা পেশাদার গরু-দালাল, একথা আগে জানা ছিল না।

গ্রাম-গ্রামান্তরের যে পাড়া-গাঁ এখন জমশেদ সাহেবের কাছে নির্মল স্বস্থির জায়গারূপে বিবেচিত, সে-পাড়া -গাঁয় দারোগার মতো টাউট-বাটপাড়েরও বিরাজ আছে! ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ই বেখাপ্পা আর পীড়াদায়ক লেগেছিল।

নৌকো চলছে হাওড়ের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দাবড়ে হেলেদুলে কঠিন লড়াই করে। নীচে ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ। ওপরে শোঁ-শোঁ বাতাস। সাঈদ সাহেব নৌকো চলাচলে অনভ্যস্ত। মনে ভয়-ভয় লাগছে। জমশেদ সাহেব বসে আছেন ভাবলেশহীন।

কেটে গেল দীর্ঘ সময়। জমশেদ সাহেব দারোগাকে নৌকোতে দেখার পর হতে মনটা এখনো কর্দমাক্ত। সেদিনকার সরল বিশ্বাসে গচ্ছা খাওয়ার ক্ষত মুছতে চাচ্ছে না মন থেকে।

জমশেদ সাহেব একটু নড়েচড়ে বসে বন্ধু সাইদ সাহেবকে বললেন, 'ওই যে বনবাঁদরটা বসে আছে। দেখেছ? মনে আছে গরুহাটে ধরাটা খেয়েছিলাম যার খপ্পরে পড়ে?'

ঃ আরে ! তাই তো দেখছি। এইশালা খবিসের বাচ্চা এখানে?

ঃ তার বাড়ী আমার এলাকায় না?

দু'জনে কথা বলতে বলতে দারোগার সাথে জমশেদ সাহেবের একদম চোখাচোখি দেখা। প্রথম দেখাতেই দারোগা দাঁড়িয়ে সরল হাসি হেসে উৎসাহ আর আদবের সাথে সালাম করল। একপা-দু'পা করে চলে এল কাছে। জমশেদ সাহেব মলিনমুখে কেবল ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলা ছাড়া বাড়তি একটি কথাও বললেন না।

দারোগা দাঁড়িয়ে থেকে কাঁচুমাচু করে হাতের আঙুল মটকাচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় লাজ-নম্র হাসি। জমশেদ সাহেবের দিকে মুখ করে ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে আছে নীচ দিকে। মনে ভরসা, সেদিনকার গরুহাটে এই সাহেবের জন্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওই শ্রম দেওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এখন নিশ্চয় তিনি খাতিরদারি করবেন। বড়লোক

www.pathagar.com

মানুষ। বলা যায় না পকেটে হাত দিয়ে বখশিশ কিছু একটা বের করে ফেলতেও পারেন। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলে তাঁর সাথে গাঁও-গেরামের ভাষা চলবে না কিছুতেই। আদব-লেহাজের সাথে যতদূর সম্ভব শুদ্ধভাষা (মানে কথার ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি) বলার চেষ্টা করতে হবে। সবকিছুতেই আলাদা একটা চটপটেভাবও দেখাতে হবে। গরুদালালীতে মাল-কামাই কেমন হয় জানতে চাইলে সোজাসুজি অস্বীকার না-করে ফ্যাশন করে বলতে হবে- নাহ্। আইজ-কাইল ব্যপ্সা পাতির ছিরিকুটি নাই (আজকাল ব্যবসাপাতির সিকিউরিটি নেই)। তিনি গরু আরো কিনবেন কি না জানার জন্যে বলতে হবে- গোরু আরেকখান লইবেন নাহি? লইলে কইন যে। আমি আছি। হেল কইরা দিবাম (হেলপ/ help করে দেব।) আর কথা শেষ করলে ঠেংকু (থ্যাংকং ইউ/ Thank you) দিতে হবে। না-হয় সবই মান-ইজ্জতের প্রশ্ন।

কিন্তু জমশেদ সাহেব মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। কথা যা বলছেন সব বন্ধুর সাথে।

দারোগা দাঁড়িয়েই আছে। গেরামের এই রকম বড়লোকের সাথে খাতির থাকলে লোকসমাজে আলাদা একটা ইজ্জত আছে। তাই আলাপ জুড়তে তাঁর মন উসুখুসু করছে। সে জমশেদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে তাঁকে শুনিয়ে এটা-সেটা বলছে। পাশের আরেক যাত্রীকে ডাক ছেড়ে জিজ্ঞেস করছে, 'ও ইয়াকুব চাচা ! কই গেছিলা?'

ঃ ডাক্তরের ধারে।

ঃ অসুখ কার?

ঃ তোমার চাচীর।

ঃ কি, এমাজিন নাহি (ইমার্জেন্সি/emergency না কি)?

উনি ভাবলেন, এমাজিন কোনো হাল আমলের মারাত্মক রোগের নাম। তাই না-সূচক মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন, 'আরে না। হেইডা না।'

ঃ তাইলে চিন্তার কারণ নাই।

ঃ আরে কইলা কি? রোগীর অবেস্থা জরুল (অবস্থা জরুরী)। দোয়া কইরো যে।

জমশেদ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দারোগা বেশীকিছু বোঝার ভাব করে গাঢ়কণ্ঠে বলল, 'মুশকিলই অইছে।'

কিছু সময় চুপ থেকে আবার বলল, 'আজাইরা ফু-ফা (অনর্থক ঝাড়ফুঁক) দেওয়াইও না। ডাক্তরের ওষুধ খালি খাওয়াইও।' তাঁর ধারণা এবার হয়তো জমশেদ সাহেব কথা ধরবেন। কারণ শহরের লোকেরা ঝাড়ফুঁক-বিরোধী কথাবার্তাতে আকৃষ্ট হয়।

না। কিছুতেই মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ জমছে না আলাপ। জমশেদ সাহেব কথা বলছেন না। দারোগাও লেগেই আছে। সে একটা না-একটা

www.pathagar.com

কিছু শুনিয়ে জমশেদ সাহেবের মুখে কথা আনবে। তাঁর সাথে আলাপ জুড়বে। আবার বড় গলায় ইয়াকুব মিয়ার কাছে জানতে চাচ্ছে, 'ও-চাচা ! ডাক্তর কেডা?'

ঃ ভাউন্যা

ঃ ও- আচ্ছা। ভানু ডাক্তর? হ্যা-তো বমিপাতিক (সে তো হোমিওপ্যাথি)। পাশ-করা ডাক্তর না (সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ডাক্তার নয়।)

ঃ পাশ-করা ডাক্তরের লাগি ভৈরব বাজার গেছিলাম। গিয়া দেখি আচানক কারবার। ডাক্তরের চামচিয়া একজন আইয়া কয়, টিহিট কাইট্যা যাওন লাইগবো। (টিকিট কেটে যেতে হবে।) হুইন্যা এইকথা আমার মিজাজ গেলো এক্কেরে চইড়া। (শুনে একথা আমার মেজাজ গেল একেবারে চড়ে।) কও ছাইন (বলো তো) ছিনেমার ঘরে নাইচ দেইখতে অইলে টিহিট লাগে। ডাক্তর দেহাইতে টিহিট ক্যার? (সিনেমা হলে নাচ দেখতে টিকিট লাগে। ডাক্তার দেখাতে টিকিট কিসের?) কি যে এক জমুনা আইলো (কী যে এক জামানা এল !)

ঃ পরে কি অইলো? দেহাইতে পারছিলা?

ঃ না। চইল্যা আইছি।

দারোগা ডাক্তারের নাম-পরিচয় না-শুনেই মিথ্যে বাহাদুরী জাহির করল, 'আরে আমারে কইলা না? ডাক্তার হেইডা আমার বন্ধু মানুষ। ভৈরব গেলে হ্যারে লইয়া (তাঁকে নিয়ে) একসাথে চা খাই। আমার কুলুছ ফেন (ক্লোজ্ ফ্রেন্ড /close friend) লাগে। আমি কইয়া দিলে টিহিট লাইগ্‌তো না।

ঃ ইস্! আগে কি আর জানি? তয়, গেছিলাম পরে কিশোরগঞ্জে বড় ডাক্তরের ধারে। টিহিট লাগে নাই।

ঃ বড় ডাক্তর? হ্যার তো আবার রাজ্যের ডিমান (তাঁর তো আবার অনেক ডিমান্ড/ demand)। হগ্‌গলে চাস্ পায় না। (সকলে chance পায় না)। তুমি পাইছিলা। তোমার লাগ্ ভালা। (তোমার লাক /luck ভালো)।

ইয়াকুব মিয়া নিরুত্তর। ভাবলেশহীন।

দারোগা বার বার তাকাচ্ছে জমশেদ সাহেবের মুখের দিকে। আবার সেই আগের বিষয় নিয়েই বকবক চালাতে প্রশ্ন করল, 'কাম অয় নাই?'

ঃ আর কইও না যে। (আর বলো না যেন।) ওই হালার পুত ডাক্তরের জাতই না। আমার একবস্তা ট্যাহা গেছে। চাইর পইসারও কামে আইছে না। (প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। চার পয়সারও কাজে আসে নি)।

ঃ ক্যান?

www.pathagar.com

ঃ ক্যামবায় আইবো? হ্যাই লোক তার যন্ত্র লাগাইয়া ঠেস কইরলো না। (ষ্ট্যাথোস্কোপ/ Stethoscope লাগিয়ে পরীক্ষা করল না।) একটা শক্তির বোতল (ভিটামিন সিরাপ) ও দিলো না। দিলো কি জানো? একখাবলা গুলি ওষুধ (ট্যাবলেট)।

দারোগা কপালে ভাঁজ তুলে আচ্ছারকম সমঝদারের মতো মন্তব্য করল, 'মুশকিল-মুশকিল! জমুনা কঠিন পইড়া গেছে। সংসার জীবন মেনঠেস (মেনটেন্যান্স/ maintenance) কইরা চলা মুশকিল!'

জমশেদ সাহেব এতক্ষণ বেরসিকের মতো নিবৃত থাকলেও এবার মুখ খুলেছেন। তবে কারো সাথে নয়। তিনি মুচকি হেসে একাকী বিড়বিড় করে বলছেন, 'ইংরেজি রে! এ-দেশে এসে এতই দুরবস্থা ছিল তোর কপালে?'

সাঈদ সাহেব শুনে জানতে চাইলেন, 'কি? একলা আবার কথা কও কি? হাসছোও দেখছি। কি হল?'

দারোগাকে না-শুনিয়ে আস্তে করে বললেন, 'শোনো নি ওই বনবাঁদরের মুখে ইংরেজির কী দুরবস্থা ? emergency কে বলছে এমাজিন। homeopathy কে বলছে বমিপাতিক। আরো জানি কি কি কইল? হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ডাক্তার তাঁর কুলুছ ফেন। এটা কি বুঝেছ?

ঃ না।

ঃ close friend.

জমশেদ সাহেবের মুখে দারোগার কথাবার্তার এই বিশ্লেষণ শুনে সাঈদ সাহেবের হাসতে হাসতে পেটে ব্যাথা ধরে গেল। শেষপর্যন্ত তুমি মজা করলে ভাই- এপর্যন্ত বলার পর হাসির চোটে আর কথা বলতে পারছেন না।

জমশেদ সাহেব নিজেও হাসছেন। বললেন, 'না-না। হাসির কিছু না। একটা বিষয় দেখো। ওর মতো ছেলে কথায় কথায় ইংরেজির বাহানা না-ওড়ালে কী হয়? নিজের মাতৃভাষা রেখে এভাবে ভূল উচ্চারণে ইংরেজি বলার হেতু কি? কী এর স্বার্থকতা?

ঃ এখানে আসলে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। ধ্যান-ধারণার ব্যাপার। এই শ্রেণীর লোকেরা কথাবার্তায় দু'চারটা ইংরেজি বলতে পারাটা মনে করে সভ্যসমাজের সাথে জাতে ওঠা।

ঃ তাহলে কি ওরা নিজেদের অসভ্য মনে করে?

ঃ এটা না ঠিক। তবে সভ্য সমাজের অন্তর্ভূক্ত মনে করে না। তাছাড়া ভূল উচ্চারণের পেছনে আরেকটা বোধগম্য কারণ রয়েছে। ওরা নিজচোখে বানান পড়ে

www.pathagar.com

শব্দ উচ্চারণ শেখার সুযোগ পায়নি। ইংরেজি যা বলে তা অন্যের মুখ থেকে শোনা।

ঃ আমরা এসে গেছি আমাদের গন্তব্যে।

নৌকো জাইল্যাবাড়ীর কাছে এসে ভিড়ল ঘাটলায়। জমশেদ সাহেব সারা পথে কতক্ষণ পর পর কেবল গরুদালাল দারোগার দিকে চোখ বাঁকা করে তাকিয়েছেন। তাঁর কথাতে কান দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। সে-কখনো তাঁর মুখের দিকে আগ্রহের সাথে তাকালে তিনি তখন অন্য মনস্কের ভাব দেখিয়েছেন।

দারোগা নামল নৌকো থেকে। তাঁর ডান কাঁধে একটা বোঁচকা ঝোলানো। জমশেদ সাহেব আর সাঈদ সাহেব নামলেন পিছু পিছু।

দাঁড়িয়ে থাকা ভবানির মা অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছে, ঘাটলাপাড়ের পিচ্ছিল মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গেঁথে টিপটিপ করে হেঁটে সবার আগে আগে আসছে তাঁর পুত্র দারোগা মিয়া। সে তখনো মাকে দেখে নি।

ওপরে উঠতেই দেখা মায়ের সাথে। মা পুত্রের মুখ দেখে কেঁদে ফেলল। পুত্রের চোখ দুটোও ছলছল। সে বাঁ হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে ডান হাতে কাঁধের বোঁচকাটা নামিয়ে দিল মায়ের হাতে। বোঁচকাতে দু'সের বাতাসা আর আধসের উখড়া (মুড়কি)। ভাজা গুড়ের গন্ধ ভুর ভুর করে এসে নাকে লাগছে। দারোগা মিয়ার পরনের জন্যে সাথে করে নেওয়া শার্ট আর লুঙ্গীও আছে বোঁচকাতে।

বাতাসা আর উখড়া দেখে ভবানির মা খুশী হয়ে আবেগ প্রকাশ করল, 'পুত রে ! তোমার নাই ট্যাহা-পইসা । আমার লাগি ইসব আইন্যা ট্যাহা উড়াইলা ক্যান?'

দারোগা মিয়া কোনো জবাব না-দিয়ে নিঃশব্দ স্নেহের একগাল হাসি হাসল। তারপর খানিক নীরব থেকে আমতা আমতা করে বলল, 'মউলানা সাব কইছেন ওয়াজে হুনলাম, দূরদ্যাশ থেইক্যা বাইতে (বাড়ীতে) গেলে মায়ের লাগি কিছু সওদাই কইরা নিও। দেখবা মা খুশী অইছে। তহন আল্লাহ তালা খুশী অইবু। দুইন্যাই-আখেরাত তোমার রোশনাই অইবু।'

ভবানির মা মনে মনে পুলক আর গর্ববোধ করে জানতে চাইল, 'ওয়াজে? কই হুনলা?'

ঃ অষ্টগ্রাম বাজারে টেপের মাঝে বাজাইছিলো একলোক।

ঃ আল্লায় তোমারে ভাতে-পুতে (অন্ন আর সন্তান-সন্ততিতে) সুখী কইরবো।

ভবানির মা সাথের সফর বানুর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'পুবের বাড়ীর তোমার চাচীরে ভালামন্দ জিগাইলা না (কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে না)?'

www.pathagar.com

দারোগা একথায় ভালোমতো কান না-দিয়ে একটার পর একটা ফটাফট জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে প্রথম দফাতেই জেনে নিল বাড়ীঘরের সব খবর। কিন্তু বাবা মেরেছিল কি না, শুধু এ-বিষয়টাই জানতে চাইল না। কারণ পুত্রদের চোখের সামনে বাপের হাতে মায়ের মারপিট খাওয়ার যে কান্ডলীলা অহরহ ঘটে আসছে, তা নিয়ে অতীতে কোনোদিন তাঁরা মাথা ঘামায় নি। আজ আর সেটা খোঁজাখুঁজির মতো এমন কী বিষয়?

কে জানে, হয়তো দারোগা মিয়াও মনে করে, বউপেটানো প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। মা যেহেতু বাবার বউ, অতএব কারণে-অকারণে বাবা মা'কে পেটাতেই পারে।

পুত্রচিন্তায় কয়েকদিন ধরে মনো-যাতনা ভোগার পর এবার পুত্রের মুখ দেখে হৃদয়ে অপার শান্তনা এসেছে ভবানির মা'র। আনন্দিত মনে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজেই পুত্র আর সফর বানুকে নিয়ে বাড়ী রওয়ানা দিল। আগামীকাল পুত্রসহ মালিকের দরগায় গিয়ে মান্নত পূরণ করবে।

জমশেদ সাহেবদেরও ছাতা নেই। বৃষ্টি যেভাবে পড়ছে, তাতে গা-গতর ভিজবে না ঠিক। কিন্তু কাপড়ের ইস্ত্রি নষ্ট হবে। সর্দিও হতে পারে। তাই তাঁরা ওদিককার তল্লাবাঁশের নুয়ে থাকা ঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়েছেন। লতানো কুঁচগাছের ঝোপের আড়াল থেকে মুখ উঁচিয়ে এতক্ষণ নজরটা দিয়ে রেখেছিলেন দারোগার দিকে।

তাঁরা দারোগাকে সমাজের অনিষ্টকর আবর্জনা হিসেবে গন্য করে তাঁর অঙ্গভঙ্গি, মায়ের সাথে সাক্ষাত, মা-পুত্রের আবেগপূর্ণ সংলাপ- সবকিছু দূরে থেকে দেখে দেখে রসিকতার সাথে তামাশা উপভোগ করছিলেন। কিন্তু আদ্যোপান্ত অবলোকনের পর জমশেদ সাহেবের মাথার চিন্তায় এক তোলপাড় হয়ে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর সাঈদ সাহেবকে বললেন, 'ওদের আলাপ-আলোচনা শুনে বুঝেছ কিছু?'

ঃ হ্যাঁ। সবটাই বুঝেছি। ছেলে বুঝি বেশদিন ধরে দূরে ছিল কোথাও। অপেক্ষায় মা এগিয়ে এসেছে। কোথাকার কোন এক মাজারে যেতে সম্ভবত মান্নতও করেছে। আর ছেলে ওয়াজ শুনে নতুন জ্ঞান লাভ করে মায়ের জন্যে কোনোকিছু কেনাকাটা করে নিয়ে এসেছে। এই আর কি ! ওদের ভাষা সব বুঝি নি। তবে যে টুকুই বুঝেছি, বেশ ইন্টারেষ্টিং লাগল। আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যরস আছে।

ঃ তা তো বুঝলাম। আমি সেটা বলছি না।

ঃ তাহলে কোনটা?

জমশেদ সাহেব মুখটা নীচ থেকে ওপরে উঠালেন। কপালে ভাঁজ তুলে ধীরকণ্ঠে বললেন, 'এখানে গভীর উপলব্ধির একটা ব্যাপার আছে। যা আমি লক্ষ করে বিস্মিত

www.pathagar.com

হয়েছি। আচ্ছা। দেখো তো, বেশদিন পর মাকে দেখে আবেগে যে ব্যক্তি কেঁদে ফেলেছে, কত কোমল তাঁর হৃদয়-মন মায়ের প্রতি! কত পূতময় তাঁর মাতৃটান! ঠিক না?'

ঃ হ্যাঁ। তাই তো।

ঃ কিন্তু আসলে সে-লোকটা কেমন?

ঃ কেন?

জমশেদ সাহেব ধ্যানভঙ্গের মতো আঁৎকে উঠলেন, 'কেন মানে? সমাজের কিছু মানুষের জন্যে সে কি বড় ধরনের একটা ঠকবাজও নয়? কারণ তাঁর গরুদালালী নামক পেশাটার মূল ভিত্তিটাই যে লোকঠকানো।'

ঃ হ্যাঁ। তা বটে।

ঃ কিন্তু যে-কোমলপ্রাণ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় আজ মায়ের জন্যে নতুন কেনাকাটা করে এনেছে ওয়াজ শুনে, সে কি জানে যে লোকঠকানো আল্লাহর কাছে কত ঘৃণিত? পরিণাম কত দুর্বিষহ? সত্যি-সত্যি জানলে কি সে ভালো হতে পারত না?

ঃ তা ঠিক বলেছ। জানলে সে একজন সৎ মানুষে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তাঁকে সে-রকমভাবে জানাবে কে? এর জন্যে উপযুক্ত লোক দরকার আছে না? যথাযথ পরিবেশেরও একটা ব্যাপার আছে।

ঃ সে-সব হতে পারে কেমন করে?

ঃ হবে আর কেমন করে? এ-যুগে তোমার মতো অপরকে নিয়ে এরকম করে ভাবে আর কয়জন বলো?

একথা শুনে জমশেদ সাহেব কিছুটা থমকে গেলেন। তিনি ভাবুক স্বভাবের মানুষ। দেশ ও সমাজ নিয়ে ভাবেন। ভাবেন নানা দুরবস্থার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে। তাঁর কোনো কোনো নেতাগোছের বন্ধুরা এই ভাবাভাবি পছন্দ করেন না। সুযোগ পেলেই বিদ্রুপ করেন, 'সমাজে কার কি হল-কার হল না, সে-সব নিয়ে মাথাকুটে আপনার কী? শান্তিতে নোবেল বাগানোর তালে আছেন বুঝি?' কেউ বলেন, 'কি ভলটেয়ার না কার্লমার্কস হতে চাও?' এসব কথা জমশেদ সাহেব গায়ে না-মাখলেও দেশ ও সমাজ নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই দেখে মনে বেদনাহত হন। এটাই তাঁর অভ্যেস। সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেউ ভাবছে না, একথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে খুব অসহায়বোধ করেন। থমকে যান। সাঈদ সাহেবের কথা শুনেও এখন তাঁর তা-ই হয়েছে। আনমনা হয়ে ধীর-ধীর উচ্চারণে হতাশ গলায় বললেন, 'কেউ ভাবে কি না জানি না। তাছাড়া এমন ভয়ংকর পানির বিচ্ছিন্ন জনপদগুলোতে কে আসবে? আজকাল

www.pathagar.com

অবশ্য বেশকিছু এনজিও'র লোকেরা আসছেন আশপাশের নানা গ্রামে। প্রশিকা, ব্র্যাক, গণউন্নয়ন, নারীমৈত্রী, গ্লোবাল ভিলেজ-এই সব। কিন্তু তাঁদের দ্বারা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি তো আর সম্ভব নয়।'

ঃ তুমি ঠিক বলেছ। এর জন্যে প্রয়োজন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাযকিয়ায়ে নাফ্স এর শিক্ষা বিস্তার। সে-শিক্ষার আলো ছড়াতে কে আসবে? কে আসবে এমন দূর্গম জায়গায়?

ঃ কেন? কেউ না-এলে এই অঞ্চলের মানুষ ইসলামের দাওয়াত পেল কেমন করে? গ্রামের পর গ্রাম এই মুসলিম জনবসতি সৃষ্টি হল কেমন করে?

ঃ সেটাও কথা।

ঃ ইতিহাস থেকে যতদূর জানি, ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে এ-অঞ্চলে তিন বুযুর্গ এসেছিলেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। সেই সুদূর ইয়ামন, বাগদাদ ও কান্দাহার থেকে। একজনের নাম হজরত শাহ্ দারিয়া রহ.। একজনের নাম হজরত শাহ্ লতীফুল্লাহ্ রহ.। আরেকজনের নাম হজরত শাহ্ আকীল মওলা রহ.। তাঁরা ছিলেন উঁচু স্তরের কামেল দরবেশ। তাঁরা আল্লাহ্-রাসুলের বার্তা পৌঁছায়ে দিয়েছিলেন প্রতিটি গ্রামে-পাড়ায়। এমনকি ঘরে ঘরে। জনে জনে। তখন অল্পকিছু-সংখ্যক বাদে এ-অঞ্চলের মানুষ তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল। গ্রহণ করেছিল ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। মানুষ হাঁটতে শুরু করেছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির পথে। সেই বুযুর্গদের সাথে অবশ্য স্থানীয় স্বৈরাচারী জমিদারদের বিরোধও বেঁধেছিল। সেটা আজ থেকে প্রায় সাত শো বছর আগের কথা।

সাঈদ সাহেব কৌতুহলে দু'হাত নাড়িয়ে চমকে উঠলেন, 'চমৎকার তো ! কই, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন আছে কিছু?'

ঃ হ্যাঁ। অবশ্যই আছে। থাকবে না কেন? মিঠামইনের ৪নং ঘাগড়া ইউনিয়নের এক কৃতিত্বধন্য গ্রামে এই মহান বুযুর্গরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। জায়গাটি এখন 'মালিকের দরগাহ্' নামে পরিচিত। সেকালের ইট-সুড়কির নানা স্থাপনার স্বর্ণালী প্রত্ন-নিদর্শন আজো সগৌরবে ডাকছে মানুষকে। এই তিনি বুযুর্গ যখন এসেছিলেন, বাংলার শাসনকর্তা তখন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্।

ঃ সময়কালটা বলতে পার?

ঃ সময়কাল? সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্'র শাসনকাল ছিল সম্ভবত ঈসায়ী ১৩০১ থেকে ১৩২১ সন পর্যন্ত। সেটা ছিল শাহ্জালাল রহ. এর যুগ। তখন মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছিল, তা-ও বহুকিছু উবে গেছে দিনে দিনে। এই

www.pathagar.com

দীর্ঘকালের ব্যবধানে জ্ঞানচর্চার অভাবে। মুর্খতা, কুসংস্কার -এ-সব এখন এখানে জীবনের সাথে মিশে গেছে।

ঃ আর কী উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেছে এই এলাকায়?

ঃ বৃটিশ-শাসনের অবসানের পর স্বাধীন পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত ছিঁটেফোঁটা যা হয়েছে, সবই বৈষয়িক উন্নয়ন। এই তো-মিঠামইন উপজেলা সদরে আজকাল উন্নতি হয়েছে। উন্নতি হয়েছে অথই হাওড়ের পানিতে ভাসমান অষ্টগ্রাম উপজেলারও। চোখ ধাঁধানো দালানকোঠা তৈরী হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে উপজেলা পরিষদ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, স্যাটোলাইট ক্লিনিক-অনেক কিছু। তাছাড়া শিক্ষিত-জ্ঞানীগুণী লোক অনেক আছেন। দেশের সভ্য-সুশীল সমাজের সাথে তাঁদের ওঠাবসা সবই আছে। তাঁরা আর কী করবেন? তরীকপাশার পানিবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন জনপদে মানুষের জীবনে শিল্প সভ্যতার বিবর্তনের কোনো প্রভাব আজ পর্যন্ত পড়েনি।

ঃ কোনো দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি?

ঃ আমার জানা মতে একটাও না।

ঃ তার মানে এই এলাকার মানুষদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের বিষয়টা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই উপেক্ষিত থেকে আসছে।

সাঈদ সাহেব পানির দিকে আনমনা হয়ে চেয়ে চুপ করে আছেন। জমশেদ সাহেব জানতে চাইলেন, 'কি হল? ভাবছ কি?'

ঃ না। নিজেকে জাতি হিসেবে বড়ই দুভার্গা মনে হচ্ছে।

ঃ কেন?

ঃ প্রত্নতত্ত্বের ওপর উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রীধারী একজন শিক্ষক আমি। আমি অপরের ইতিহাসের খুদকুঁড়ো নিয়ে মরা পুকুরে নদীর বান ডাকাতে পারদর্শী। অথচ আমার নিজের শেকড়ের ইতিহাসের হাতেখড়িও নেই।

বাঁশঝাড়ের নীচে দু'জনেই নিশ্চুপ ধ্যানমগ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। সাঈদ সাহেব বললেন, 'ডুবো-সড়ক তো দেখা হল। আগামীকাল চলো তাহলে মালিকের দরগাহ্ দেখে আসি।

পাঠক! শিক্ষক সমাজের চিন্তাধারা শিক্ষাদীক্ষা নিয়েই বেশী হয়। এই বরেণ্য দু'শিক্ষকের আলোচনা থেকে আমাদের সটকে পড়া দরকার। এসব দর্শন, ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার। বৃষ্টি তাঁদের আটকে দিয়েছে। ভবানির মাকে পারে নি। সে এতক্ষণে বাড়ী পৌছে গেছে। তাই নজর দেয়া যাক ভবানির মা আর তাঁর স্বনামধন্য স্বামী রজব আলী মাষ্টর কে কি করছেন। কেমন কাটছে তাঁদের পরবর্তী দিনকাল।

www.pathagar.com

॥ ৬ ॥

'মাইন্‌সে আম্‌গ ভাঁটিদ্যাশের লোক কয় ক্যান?'

এই সরল জিজ্ঞাসাটি ছুঁড়ে দিয়ে ভবানির মা স্বামীর মুখের দিকে আদুরে বিড়ালের মতো তাকিয়ে আছে নীরবে। অপেক্ষা করছে স্বামী কী জবাব দেয়। রজব আলী কোনো কথা বলছে না। রাতের খাবারে বসে ব্যস্ত হয়ে নির্বিকার খেয়েই যাচ্ছে। পাশে পোষা বিড়ালের মিঁউমিঁউ শুনে কতক্ষণ পর পর বিরক্তির সাথে কেবল চোখ বাঁকা করে তাকাচ্ছে। ইচ্ছে করছে বিড়ালটাকে কশিয়ে একটা লাথি দিয়ে তাড়াতে। কারণ পাতে ভাত নেই। আছে ক'টা লম্বা আলু। বিড়াল কি সেটা দেখতে পাচ্ছে না? সারাদিনের ক্লান্ত রোগা শরীর নিয়ে এখন রাতেরবেলা বাড়ী এসে লম্বা আলু খেতে বড় অস্বস্তি লাগছে রজব আলীর। গিলতে হচ্ছে চোখ বুজে গলার ঢোঁক টেনে টেনে। এতেই গেছে মেজাজ নষ্ট হয়ে। সাথে আবার বিড়ালের উটকো জ্বালাতন। এখানেই শেষ না। ভবানির মাও যন্ত্রণা করছে অনর্থক প্রশ্ন করে।

এই এলাকায় লম্বা আলুর আরেক নাম মদন। কেউ কেউ বিলাতী আলুও বলে। শিক্ষিত লোকেরা বলেন মিষ্টি আলু।

কয়েকদিন ধরে রজব আলীর ঘরে ভাতের পরিবর্তে লম্বা আলু চলছে। অবশ্য তিনবেলা নয়। শুধু রাতে। উদ্দেশ্য ভাত-সাশ্রয় করা। বছরের এই সময়টাতে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাতের পরিবর্তে লম্বা আলু সকলে খায়। গরীব ও হিসেবী লোকেরা এই জিনিস খেয়ে খিদে নিবারণ করে। আর খাবারবিলাসী ধনীরা খায় শখ করে। পাড়াপড়শী অনেকের ঘরে দৈনিক তিনবেলার তিনবেলাই চলে এই লম্বা আলু।

এই আলু খাওয়ার পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। এলাকায় এর চাষ হয় ব্যাপকহারে। অথচ বাজারমূল্য তুলনামুলক কম। দামে অনেক সস্তা। সবার কাছে সহজলভ্য। তাছাড়া এটি খেতে আনুষঙ্গিক কোনো খরচ নেই। তেল, মরিচ, পেঁয়াজ-এ সবকিছু লাগে না। তার ওপর আবার এটি পাকাতেও কোনো ঝামেলা নেই। কোনো রকম সেদ্ধ করে নিলেই হল। ছাল তুলে সোজা খেয়ে ফেলা। বেশ মিষ্টিও লাগে খেতে। কিন্তু আজকাল রজব আলীর রোগা শরীরে এসব খেতে মোটেও ভালো লাগে না। খেতে বসে পাতে মদন আলুর চেহারা দেখামাত্র মেজাজ চড়ে যায়।

ভবানির মা ব্যক্ত করা জিজ্ঞাসা আরেকটু খোলাসা করে বলল, 'ছুড়ুকাল থেইক্যা হুনি (ছোটবেলা থেকে শুনি), মাইন্‌সে আম্‌গু খালি ভাঁটিদ্যাশের লোক কয়। উজানী নগরের

www.pathagar.com

দাওয়াল আর গাবর ব্যাটারাও কইল, চাচী গো! তোমরা অইলা ভাঁটিদ্যাশের লোক।'

রজব আলী কোনো জবাব দিচ্ছে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে কালপেঁচার কর্কশ আর্তনাদ আসছে। পেঁচা জিরিয়ে জিরিয়ে টানটান তীক্ষ্ম সুরে গলায় ঝংকার তুলছে, খুঁ...খুঁ... খুঁ।

ভবানির মা'র অন্তর কেঁপে উঠল আতংকে। এ্যাঁ! দুশমন পেঁচা ডাকে? তবে তো সাংঘাতিক কু-লক্ষণ! দেরী না-করে এ দুশমন তাড়িয়ে দিতে হবে। শুধু শুধু তাড়ালে হবে না। এর জন্যে আলাদা টোটকা আছে। নিয়ম-কানুন আছে। সে-অনুযায়ী তাড়াতে হবে। না-হয় আলাইবালাই নেমে আসতে পারে।

খেতে বসা স্বামীর ধার থেকে চট করে উঠে গেল ভবানির মা। একটা ঝাঁটা আর কোলা নিল হাতে। তারপর আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল গিয়ে বাঁশঝাড়ের নীচে অন্ধকারে। পেঁচা যখনই ধীরে সুস্থে গলায় সুর তোলে, ভবানির মা তখনই কোলার ওপর ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে ঠাস-ঠাস আওয়াজ করে আর মুখে ডাকছেড়ে আওড়ায়-

দুর দুশমন!

তোর মুহে মারি ঝাঁটা।

এভাবে কোলায় বাড়ি দিতে দিতে একদমে দুই-তিনবার করে বলে বাক্যটা। কিন্তু পেঁচা তার ঝংকৃত সুরের লহরি কিছুতেই স্তব্ধ করে না। এরকম সুরের ঝংকার মানুষের কানে শ্রুতিমধুর লাগছে না, কিংবা কেউ অলীক ধারণা-তাড়িত হয়ে আতংকবোধ করছে, তা পেঁচা বোঝে না। ভবানির মা পরবর্তী বাক্য আওড়ায়-

দুর দুশমন!

তোর কইলজায় পইড়বু ঠাডা।

চইল্যা যা-চইল্যা যা।

এভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ

পেঁচা এসব বোলচালের মর্মার্থ বুঝতে সমর্থ না-হলেও মানুষের সরব আনাগোনা দেখে ভয় পেয়ে গেল। উড়াল দিয়ে চলে গেল অন্য কোথাও নিরিবিলি জায়গার খোঁজে।

ভবানির মা স্বস্থিবোধ করে ঘরে ফিরে এল। কিন্তু আরেক বিপত্তি ! বিড়ি রাখার পাতিলটা মাটিতে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। বিড়িগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। স্বামী চোখ লাল করে বলল, 'লাড়হির লাহান খটখটা মদন (লাকড়ির মতো শুষ্ক লম্বা আলু।) আমার গলা দি যায় না। মদন দিলে পানি দেউন লাগে না?'

ভবানির মা পাতিল ভাঙ্গার কারণ বুঝে ফেলল। খাওয়ার পানি ঢেলে দিতে তার মনে ছিল না। চাওয়ামাত্র পানি না-পেয়ে বেচারা গোস্‌সা ঢেলেছে ঘরের বউয়ের

www.pathagar.com

অবর্তমানে পাতিলেল ওপর। পাতিলটা কাছে ছিল।

স্বামী আগের মতোই আলু চিবিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মূহূর্তে ভবানির মা'র ওপর আক্রমণ শুরু হতে পারে। তাই স্বামীর কথার পর কোনো রা-কাড়ল না। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে পানি ঢেলে দিল গ্লাসে।

খাওয়ার ফাঁকে রজব আলী পানি কয়েক ঢোঁক খেয়ে গলা ভিজাল। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোর জানে ঘরবাড়ি লয়না ক্যা? গেছিলি কই?'

ঃ দুশমন খেদাইয়া আইলাম।

ঃ দুশমন? এইডা আবার কেডা?

ঃ পেঁচা।

রজব আলী নীরব রইল।

ভবানির মা মনে মনে আস্বস্থ হল। আজ তাহলে মারপিট বাঁধাবে না। তাই আগের সেই জিজ্ঞাসা পূনঃ উথাপন করল, 'দুইন্যাইডাতে হগ্‌গলই ত ভাঁটিদ্যাশের লোক (দুনিয়াটাতে সকলেই তো ভাটি এলাকার লোক), আম্‌গ এক্‌লা অইলাম ক্যাম্‌বায়?'

রজব আলী এবারো নীরব রইল।

ভবানির মা এ-রকম নানা আজব কথাবার্তা প্রায়ই বলে। সে আশপাশের দুয়েক গ্রাম ব্যতীত অনা কোথাও যায় নি জীবনে। তাঁর জগত বলতে এ-পর্যন্তই। এর বাইরের জীবন ও জগত সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই তাঁর। জীবনে সবচেয়ে দূরবর্তী যে জায়গাটি তাঁর বেড়িয়ে দেখা হয়েছে, তার নাম বাজিতপুর। তখন ছিল আশ্বিন মাস। 'আইশ্‌না পানি' (আশ্বিনমাসীয় অকাল বন্যা) নেমেছিল। ভেসে গিয়েছিল বাড়ীঘর, গরুবাছুর-সবকিছু। গাঁও-গেরামে দেখা দিয়েছিল নিদারুণ কাহাত (দুর্ভিক্ষ)। শুরু হয়েছিল চুরি-ডাকাতি। বাবা ছুরত ব্যাপারী তখন তাঁর উপযুক্ত মেয়ে আলাতন বিবি (ভবানির মা) কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাজিতপুরে এক অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের বাড়ী। সেই সুবাদে বাজিতপুর দেখা।

কিশোরগঞ্জ, কুলিয়ারচর, ইটনা, শরীফনগর, কাকাইছেও, আজমিরিগঞ্জ-এসব জায়গার নাম শুনেছে ভবানির মা। বেশী শোনা মিঠামইনের নাম। স্বামীর সেখানে যাওয়া-আসা আছে।

হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া আর কিশোরগঞ্জের ২৯টি উপজেলা-এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এখানকার এই ভাটি অঞ্চল। এধরনের অথই পানিবিহীন বিশাল-বিস্তৃত শুকনো জনপদ বহু আছে দেশে, একথা ভবানির মা'র ধারণার বাইরে।

www.pathagar.com

ভবানির মা'র তরীকপাশা গ্রামটি আয়তনে তুলনামুলক ছোট। মোট চার কুড়ি আষ্ট (অষ্টাশি) ঘর বাসিন্দা আছে এই গ্রামে। এখানকার অনেক পুরুষ আছেন, যাঁরা কোনো দিন বাস বা ট্রেনে চড়েন নি। কেউ কেউ বাস-ট্রাক চোখেও দেখেন নি। অধিকাংশ মহিলা রিক্সাও দেখেন নি জীবনে। ভবানির মা একবার দেখেছে। চড়েছেও। সেটা হয়েছিল সেই বাজিতপুরে গিয়ে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগের কথা।

তরীকপাশা গ্রামে অনুর্ধ বারো-তেরো বছর বয়সী ছেলেমেয়ে আছে প্রায় ষাট-পয়ষট্টি জন। এঁরা কারোই যাওয়া হয় নি জীবনে তরীকপাশার ভূ-খন্ডের বাইরে। জন্মের পর থেকে শুধু অথই পানি দেখে আসছে। বই দেখে নি। পড়ালেখা দেখে নি। শুধু এ-গ্রামেই নয়, আশপাশের কোনো গ্রামেও মক্তব-মাদ্রাসা নেই। স্কুল নেই।

স্কুল-মাদ্রাসা হবেই বা কেমন করে? এ-অঞ্চলের অনেক বাড়ী আছে, যেখানে বর্ষাকালে পাশের বাড়ীতে যেতেও মধ্যিখানে অথই পানি। যেতে হয় বাঁশের সাঁকো বেয়ে। না-হয় নৌকো চড়ে। এই পানি থাকে বৈশাখ থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। পাকা ছয় থেকে সাত মাস। পানির সময় পাড়া আর গ্রামগুলো দেখতে লাগে ছোপ ছোপ ফেনার মতো ভাসমান। এ-গুলো আয়তনে কোনোটি ছোট। কোনোটি বড়। অনেক ক্ষেত্রে একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব তিন-চার মাইলের বেশীও আছে। মাঝখানে শুধুই গহীন হাওড়ের অথই পানি আর ভয়ংকর সব ঢেউয়ের খেলা। এমন জায়গায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি গড়ে ওঠে, তবে প্রতিটি পৃথক ভূখন্ডে একটি করে প্রতিষ্ঠান দরকার। তাতে প্রতিদিন শিক্ষক আসা যাওয়ার উপায় আছে কি?

যে কয়টি বড় গ্রামে বিদ্যালয় আছে, তাতে অনেক বিদ্যালয় বর্ষা উপলক্ষে বছরে ছ'মাস থাকে অঘোষিত ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক যাঁদের কাছেপিঠে বসবাস, তাঁরা জনাকয়েক এসে হাজিরা দিতে সক্ষম হন। শুয়ে-বসে কতক্ষণ ঝিমিয়ে-জিরিয়ে যে যাঁর পথে চলে যান। মনে মনে অপেক্ষায় থাকেন, বর্ষা একসময় চলে যাবে। বিদ্যালয়ে তখন প্রাণচাঞ্চল্য ফিরবে। লেখাপড়া হবে।

এখানকার জনজীবনে জ্ঞানের আলোর ছোঁওয়াও লাগবে হয়তো একদিন। কারণ হাওড়-বাওড় কি মানুষের চলাচল আটকে রেখেছে? না। রাখে নি। মানুষ বিহিত গড়ে তুলেছে। বানিয়েছে নৌকো-সেতু, আরো কত কী ! তাহলে জ্ঞানের আলো আটকে থাকবে কেন? নৌকো করে ভ্রাম্যমাণ কুরআন শিক্ষা-আসর, মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা-আসর, লেখাপড়া শিক্ষা-আসর, এসব হয়তো কোনো একদিন এই এলাকায় চালু হবে। নৌকো চড়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে ভ্রাম্যমান মক্তব-বিদ্যালয়। সারাদিন পালা অনুসারে বিতরণ করে যাবে জ্ঞানের আলো। কিন্তু সেদিন যে আসে নি এখনো।

www.pathagar.com

তরীকপাশা গ্রামে টাকার লেনদেন কম। শুধু এ-গ্রাম কেন, আশপাশের সকল গ্রামেই এ-অবস্থা। এ-অঞ্চলে কিছুদূর পর পরই বাজার নেই। বাজার বসবেই বা কেমন করে? কোথায় বসবে? এ-রকম ফেনার মতো ছোপ ছোপ ভাসমান আর দূর-দূরান্তে বিচ্ছিন্ন প্রতি পাড়া-গাঁয় একটি করে বাজার বসানো ছাড়া উপায় আছে? কিন্তু তা-কি সম্ভব?

বৈশাখী ধানকাটা শেষে একশ্রেণীর দোকানদার আসে নৌকো নিয়ে। নৌকোর পাটাতনে থাকে নানা জাতীয় জিনিসপত্রে পসরা সাজানো। মেয়েদের সাজের জিনিস, পুরুষদের লুঙ্গী, মহিলাদের শাড়ী আর পান, লবন, কেরোসিন- এ-সব জিনিসই বিক্রি হয় বেশী। সারা বর্ষাতেই চলে এই ভাসমান দোকানগুলো।

বেচাবিক্রি আবার টাকায় নয়। ধানের বিনিময়ে। এখানে ধান যদিও হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির ফসল। তবু ধান যত সহজলভ্য, টাকা তত সহজলভ্য নয়। বাইরের সাথে যাঁদের যোগাযোগ আছে, ব্যবসা-লেনদেন আছে, টাকা পয়সার কমবেশী নড়াচড়া কেবল তাঁদের হাতেই হয়। দু'চারজন আছেন আবার সুদের কারবারী। মানুষ অভাবে পড়তে দেখলে ছলাকলা দিয়ে সুদের ওপর টাকা গছানোর ধান্ধায় থাকেন। তাঁদের হাতে টাকা থাকে।

শুকনো মওসুমে অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত চালচিত্র আবার অন্যরকম থাকে। তখন সরগরম হয়ে ওঠে গ্রাম্য মুদি দোকান। পাড়া-গাঁয়ের দোকানদাররা মিঠামইনের ঢোপাজোড়ার বাজার ও ভরার বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে বিক্রি করে দোকানে। কোনো কোনো এলাকার দোকানে মালামাল আনা হয় অষ্টগ্রামের মেঘনা নদীর দক্ষিণ পাড়ের সেই আলীনগর বাজার থেকে। নীলগঞ্জ আর মইচখালি বাজার থেকেও মাল আসে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, লবণ, কেরোসিন, সাবান, তেল-সবই কিন্তু মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ হাওড়-বিল মাড়িয়ে আসে আদমসন্তানের কাঁধে চড়ে। রিক্সা, ভ্যান কিংবা কোনো প্রকার বাহনে করে নয়। কারণ মালামাল পরিবহনের উপযুক্ত রাস্তাঘাট কোথায়?

এই হল এখানকার ভবানির মা'র ভাঁটিদ্যাশের চালচিত্র। ভাঁটি মানে কোনো কিছুর স্বভাবসুলভ গতি যেদিকে ধাবিত। ভবানির মা'র উপলব্ধিতে জীবন ও সংসার সবই ভাটিমুখী। সমাজে লোক আছে তিন প্রকারের। এক হল যাঁরা সম্পদের মালিক। গাড়ী-ঘোড়া দৌড়ায়। তাঁরা বড়লোক। আরেক হল যাঁদের ধন-সম্পদ নেই, ছোটলোক। আর হল ভ্যাঁটিদ্যাশের লোক। এই তিন প্রকারের লোক নিয়েই জগত। ভবানির মা'র অভাব নেই। সে ছোটলোক নয়। কিন্তু গাড়ী -ঘোড়া নেই। অতএব

www.pathagar.com

বড়লোকও নয়। এ-দুয়ের মাঝামাঝিতে যাঁরা, তাঁরাই ভ্যাঁটিদ্যাশের লোক।

সকলের চেয়ে লম্বায় বেশী কিংবা বয়সে বড় বলেই কেউ বড়লোক হয় না। আবার কেউ বেটে-খাটো কিংবা বয়সে ছোট বলেও ছোটলোক হয় না। অতএব বর্ষার পানি এসে জমাট হতে থাকে এমন ভূমির বাসিন্দা বলেই ভ্যাঁটিদ্যাশের লোক হয় না।

ভ্যাঁটিদ্যাশের লোক কীজন্যে বলা হয়, এ-জিজ্ঞাসার জবাব সেদিন রজব আলী দিতে পারে নি তাঁর স্ত্রী ভবানির মাকে। রজব আলী শিক্ষিত- চিন্তাশীল হলে ভবানির মা'র উদ্ভট চিন্তা-অনুভূতির সাথে একাত্মতা পোষণ করে বলতে পারত, ভ্যাঁটিদ্যাশের লোক মানে জীবনবাদী। আমাদের এলাকার মানুষ দুর্নীতি করে টাকার পাহাড় গড়ে না। পরিশ্রম করে কাজ করে খাবার জোগায়। সম্পদ গঠন করে। আল্লাহ্‌র নাম লয়ে-লয়ে জীবন কাটায়। তাঁরা গরীব না। আবার টাকার গরমে আল্লাহ্‌র কথা ভূলে অনৈতিক ভোগাবিলাস করে না। কাজেই ভ্যাঁটিদ্যাশের লোকদের মতো সুখে-শান্তিতে আছে আর কে?

কিন্তু রজব আলী সেদিন ভবানির মাকে কোনো জবাব দিতে পারে নি। একই প্রশ্ন বার বার শোনার পর শেষপর্যন্ত সে নিত্যদিনের অভ্যেস মতো খিঁচিয়ে উঠল, 'তোর মাথায় কি গন্ডগোল ধইরছে? ইসব নান রঙের নাই-কথা (বাজেকথা) তোর মুহে আয় কোথা তনে (কোথা থেকে)?'

ভবানির মা চুপ মারল। আর কোনো কথা বললে লোকটা কিসেতে কী বলে ওঠে কোনে ঠিক-ঠিকানা নেই।

শিশু আর পাগল ব্যতীত কোনো মানুষের মনই ভাবনা-মুক্ত থাকে না। একটা-না একটা কিছু তাঁকে ভাবতে হয়। নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাইরে কেউই কিছু ভাবতে পারে না। ভবানির মাও বাড়ী বসে বসে ভাবে। নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মোতাবেক অনেক কিছুই ভাবে। সব ভাবনাই যে তাঁর উদ্ভট কিংবা বেঠিক, তা-ও নয়। যথার্থ জিনিসও ভাবে। যদিও এ-রকম এক নারীর ভাবনার কোনো কার্যকর স্বার্থকতা হয় না। দেশ ও সমাজের মানুষ এ নারীদের ভাবনার কথা জানতেও পারে না।

ভবানির মা বেশী ভাবে তিনপুত্র আর স্বামীকে নিয়েই। বিশেষ করে স্বামীর বদমেজাজ, মারপিট আর তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে। এ-সব নানাকথা তোলপাড় হয় মনে একাকী বসে কাজ করার সময়ই। আচ্ছা, সব স্বামীই কি তাঁর বউকে ধরে পেটায়? না। পেটায় না। পাশের বাড়ীর সফরবানু। বাজিতপুরের বেটি। প্রথম জীবনে স্বামীর লাথি-ঘুসি খেয়েছে কম-বেশী। দুই পুত্র আর তিন কন্যার মা। তাঁর কপাল ঘুচে গেছে। আজকাল আর মারপিট খায় না। তাঁর স্বামী তাঁকে কত ভালোবাসে।

www.pathagar.com

কত ইজ্জত করে! আর মুন্সীবাড়ীর ফকীর মন্ডল তো জীবনেও কোনোদিন তাঁর বউকে পেটায় নি। কত সুখ-আনন্দ তাঁদের সংসারে! এমন কী আর অবস্থাপন্ন গেরস্থই বা তাঁরা? জমি-জমা আয়-রোজগার তাঁদের অন্য পাঁচ-দশজনের মতোই। অথচ ফকীর মন্ডলের বউয়ের গুলবাহার শাড়ি আছে। সোনার কানপাশা আছে। সে-লোক বলে, বউয়ের ওপর অত্যাচার করতে নবীজীর নিষেধ আছে। পরিবারে কথায় কথায় মেজাজ নষ্ট হয়ে যাওয়া, গালিগালাজ করা হল ভেতরে রূহ রোগে আক্রান্ত থাকার লক্ষণ। এ-রোগের ওষুধ আছে। জ্ঞানের কথা শুনে কাজ না-হলে এর জন্যে রয়েছে অনেক আমল ও তদবীর।

ভবানির মা'র মনে আকুতিময় জিজ্ঞাসা অনেক। ব্যক্ত করার জায়গা নেই। কে দেবে জবাব? স্বামী আজ পর্যন্ত একটা পছন্দ-লাগা জিনিস বাজার থেকে সওদা করে এনে দিল না বউয়ের হাতে। লোকটা এমন কেন? এ-ভাবে আজো মারপিট-বকাঝকা করে কেন? তাঁর কি আর মার খাওয়ার বয়স আছে? গালিগালাজ শোনার দিন কি শেষ হল না? এর কারণ কি? প্রতিকার কোন পথে? স্বামীর সাথে সম্পর্কটা ভালোবাসার। তাতে মারপিটের মতো মানসিকতা কেমন করে জাগে?

এই কাজটা বেচারার অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে। আসলে তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে রূহ্। রূহে রোগ আছে। মানুষের শরীরের মতো রূহও রোগাক্রান্ত হয়। স্বামীর রূহের চিকিৎসা কে করে দেবে? কে দেবে ওষুধ? শরীরের চিকিৎসা হলে অষ্টগ্রামে না-হয় মিঠামইনে যাওয়া যেত। এমনকি বাজিতপুর কিংবা কিশোরগঞ্জে যেতেও আপত্তি ছিল না। ওইসব জায়গায় বড় ডাক্তার আছেন। আর এ-কথা ভেবেই বা লাভ কি ! বেচারা তো তাঁর শরীরের চিকিৎসাই করায় না। রাতের বেলা গলার গড়গড় আওয়াজ আর খেঁক-খেঁকানি কাশির জ্বালায় পাশে ঘুমোনো দায়। ভালোমতো খেতে পারে না। সারাবছর থাকে পেটে অসুখ। এত করে বলার পরও লক্ষ দেয় না। 'বার মাইস্যা' (বারোমেসে) পেটনামার নাকি ওষুধ নেই।

ভবানির মা'র মনে চাপা ক্ষোভ আর অভিমান পাক খেয়ে উঠছে, মাইনসে আমগু ভাঁটিদ্যাশের লোক কয় ক্যান-এ-কথা আজ জিজ্ঞেস করায় কী এমন দোষ হয়ে গেছে? মানুষটা যেভাবে খিঁচিয়ে উঠল, তাতে কি আর কিছু বলার আছে তাঁকে? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, মনে হয় সংসার-জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের কথা পাকেচক্রেও তাঁকে জিজ্ঞেস না-করাই শ্রেয়। উনি চলতে থাকুক উনার তালেই।

www.pathagar.com

॥ ৭ ॥

আজকের আসল ঘটনা ভবানির মা জানে না। জানলে মনে মনে এভাবে বিরক্ত হত না। নীরব সহানুভূতিতে কাতর হয়ে পড়ত।

আজ রজব আলী গিয়েছিল মিঠামইন বাজারে। গ্রীষ্মের এই প্রচন্ড দাবদাহে ছাতা মাথায় বহুক্ষণ ঘোরাফেরা করেছে। ফেরার সময় মাসকলাই-বীজ, কয়েক বান্ডিল বিড়ি এবং আরো নানা কিছু কেনাকাটার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু অভাবিত এক ঘটনায় সে-ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি। ঘটনাটা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে খুব। সেটা অবশ্য কেনাকাটায় ব্যর্থ হওয়ায় নয়। অন্য কারণে। তাই মনের ঝালের আংশিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভবানির মা'র ওপর।

রজব আলী আজ উত্তম-মধ্যম খেয়ে এসেছে। মিঠামইনের জনাকীর্ণ বাজারে ফৌজী লোকরা তাঁকে মেরেছে।

যে-সব সরকারী লোকের হাতে বন্দুক থাকে, শরীরে আলাদা ধরনের পোশাক থাকে, মাথায় গোলমতো টুপী থাকে, তাঁরা সবাই ফৌজী লোক। পুলিশ, র‍্যাব, আর্মি, বিডিআর-সকলকেই রজব আলী একনামে ফৌজী লোক বলে চেনে। তাঁদের দেখলে খুব ভয় পায় মনে। শ্রদ্ধাও জাগে, এঁরা দেশের সৈন্য-সেনা। তাঁদের সাথে এক বিপত্তি ঘটে গেছে রজব আলীর।

আজ রজব আলীর সংকল্প ছিল অষ্টগ্রাম যাওয়ার। রওয়ানাও দিয়েছিল। কিন্তু জাইল্যাবাড়ীর ঘাটে এসে হাজির মিঠামইনগামী এক পরিচিত নৌকো। তাঁরা তরীকপাশার 'মাষ্টর সাব'কে দেখে ডেকে তুলে নিয়ে গেল নিজেদের নৌকোতে। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবেই মিঠামইন আসতে হয়েছে।

গ্রীষ্মের ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। কিছুক্ষণ আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রোদজ্বলা গাছপালাগুলো যেন ধোওয়া-মোছা খেয়ে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তালুফাটা গরমে হঠাৎ দখিণা বাতাসের শীতল মৃদু দোলা এসে লাগে গায়। তাতে গা জুড়ায় না। বাতাসের সাথে তন্দ্রাচ্ছন্নতা এসে ভর করতে চায় যেন সারা গায়। রজব আলী রোগা-দুর্বল শরীর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখন পা যেন আর সামনে এগোতে চায় না। আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ কিংবা অষ্টগ্রাম হলে রিক্সায় চড়া যেত। রিক্সাওলাকে টাকা পাঁচটা দিলে আধা দিনের পথ যাওয়া যায় ওই রিক্সা নামক যন্ত্রটার কাঁধে বসে। কত আরামও লাগে! যদিও সামনের দিকে উল্টে পড়ে দাঁতমুখ ভাঙ্গার আতংক লাগে। কিন্তু মিঠামইন বাজারে অচল শরীর-জান নিয়ে যন্ত্রের কাঁধে

www.pathagar.com

চড়ার সুযোগ নেই। এখানে কোনো রিক্সা-গাড়ী চলে না। চলে না যন্ত্রচালিত কোনো বাহন। পায়ে হাঁটাই একমাত্র উপায়।

মিঠামইন বাজারে রজব আলী হাঁটছে। একহাতে ধরা লুঙ্গীর গোছা। অন্য হাতে ছাতা। সামনে বিড়ি দোকানদারের কাছে যাবে। দোকানদার ঘাগড়া ইউনিয়নের চমকপুর গ্রামের নুরু। খুব ঘনিষ্ট পরিচিত লোক। মিঠামইন বাজারে এলে তাঁর কাছ থেকেই রজব আলী বিড়ি কেনে। দীর্ঘদিন হল নুরু মিয়ার সাথে দেখা নেই। গত বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসের দিকে একবার আসা হয়েছিল মিঠামইনে। তখন দেখা হয়েছিল। শুকনো মওসুম আসার পর থেকে মিঠামইন আসা হয়নি। কারণ বর্ষার পানির সময় নৌকো আর শুকনো মওসুমে পায়ে হাঁটা ব্যতীত মিঠামইন আসার অন্য কোনো উপায় নেই। আজকাল সেই তরীকপাশা থেকে পা চালিয়ে সুদূর মিঠামইনে আসা রজব আলীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

আজ রোদের তেজ অন্যদিনের চেয়ে বেশী লাগছে যেন। ছাতা মাথায় হাঁটতে হাঁটতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে রজব আলীর। গায়ের কাপড় ঘামে ভিজে চপচপে। চুলের গোড়া দিয়ে টপ টপ করে পানি নামছে সারা মুখমন্ডল বেয়ে।

একটু দাঁড়িয়ে লুঙ্গীর নীচের অংশ টান দিয়ে মুখমন্ডল আর ঘাড়টা মুছে নিচ্ছে রজব আলী। মনে মনে ভাবছে, দেশে এখন জরুরী অবস্থা চলছে। সে-কারণে মিঠামইনে আজকাল ফৌজী লোকের অভাব নেই।

ওইদিকে তাঁর হাঁটুর ওপরের অংশ পুরোটা উন্মুক্ত হয়ে আছে লোকের সামনে। সে-খবর নেই। সে আয়েশী ভঙ্গীতে মুখ মুছেই যাচ্ছে।

চলতে-ফিরতে এ-ভাবেই মুখ মোছে রজব আলী। তাঁর কাছে এটা দোষের কিংবা দৃষ্টিকটু লাগার কোনো বিষয় না। ঘাড়-মুখ মানুষ মুছবে না? সবাই তো মোছে। রুমাল ব্যবহার করবে নতুন জামাই। তাই রজব আলী রুমাল সাথে রাখার কথা ভাবেও নি কোনো দিন।

এ-দিকে মুখ মোছার সময় সামনে অদূরে ছিল স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী কয়েকজন। জনা পাঁচেক ভদ্র মহিলাও ছিলেন। রজব আলীর আজব দৃশ্য দেখে খুব বিরক্ত হলেন তাঁরা। লোকটা সুন্দরী মহিলা দেখে বিকৃত লালসা-কাতর হয়ে বাঁদরামো করছে। সুন্দরী মহিলাদের পর্দাবৃত না-হয়ে সামান্য খোলা শরীরে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলতে গেলে 'বুড়ো বাঁদরের বাঁদরামো'ও যে কত সহ্য করতে হয়, এ-ই তার আরেক নজির। ওকে ধরে জুতোপেটা করতে পারলেও মনের ক্ষোভ যাবে না। এত দুঃসাহস তাঁর?

www.pathagar.com

ক্ষুব্ধ মহিলারা ফরিয়াদী চোখে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন।

রজব আলী লুঙ্গী উদলা করে মুখ মুছতে মুছতে মনে পড়ল, সামনে গিয়ে বিড়ি দোকানদার চমকপুরের নুরুকে টাকা দিতে হবে। বিড়ি কেনার টাকা। টাকা আছে জাঙ্গিয়ার পকেটে।

রজব আলীর ঝোলা ধরনের একটা জাঙ্গিয়া আছে। অষ্টগ্রামের এক দর্জিঘরে আলাদা ফরমায়েশ দিয়ে প্রস্তুত করানো। তাতে বড় করে পকেট লাগানো আছে। এর মধ্যে টাকা-পয়সা লুকানো থাকে। আজকাল পকেটমারদের যে উপদ্রব! সাংঘাতিক অবস্থা। গত বছর অষ্টগ্রামের খয়েরপুরের মুতি মন্ডলের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে টাকা লাপাত্তা হয়ে গেল এই মিঠামইন বাজারে। আজো পায় নি টাকার খোঁজ। টাউনে-বন্দরে চলতে জাঙ্গিয়ার পকেটের মতো অন্তঃপুরের সুরক্ষিত জায়গায় টাকা না-রেখে উপায় আছে?

লুঙ্গী উদলে রজব আলী আস্তে করে জাঙ্গিয়ার পকেটে হাত দিল। টাকা-পয়সার ব্যাপার বলে কথা! তাড়াহুড়ো করলে ভূল হতে পারে। ধীরে-সুস্থে দীর্ঘ সময়ে গণনা করে তিনটা একটাকা নোট আলাদা করে আনল। অবশিষ্ট ঊনিশ টাকা যত্নের সাথে গুছিয়ে রেখে দিল যথাস্থানে।

এ-দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুব্ধ মহিলাদের রাগ এতক্ষণে চরমে উঠে গেছে। তাদের একজন সাবেক এক এমপি সাহেবের ভাতিজির বান্ধবীর বোন। বেচারী প্রতিবাদীর মতো তেড়ে এসে হাত নাচিয়ে বললেন; এ্যাই মিয়া! এদিকে আসেন।'

রজব আলী বেকুবের মতো চেয়ে আছে দাঁড়িয়ে। কোনো কথা বলছে না।

ঃ কি হল? আসছেন না কেন?

কিছু বুঝতে পারছে না রজব আলী। কৌতুহল নিয়ে কাছে এল।

মেয়েটি একদমে বকা শুরু করল, 'পরনারী দেখলেই বাঁদরামো করতে খায়েশ হয়। না? তোর বাড়ীতে মা-বোন নেই idiot...basterd .... Lecher?

রজব আলী হা-করে ময়লা ভর্তি দাঁত বের করে শীতল চোখে তাকাল। খানিকপর একটা ঢোঁক গিলে ভেজা গলায় বলল, 'আম্মাজান ! আপনের কথা বুঝবার পারি নাই।'

ঃ কি বলছিস বদমাশ! ঠেকায় পড়ে ভণিতা করছিস?

মেয়েটি রজব আলীর কলার ধরতে হাত বাড়াল। রজব আলী কিছুটা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে তারপর চোখ রাঙা করে ফেলল, 'কি অইছে আপনের? আমার লগে কি লাগাইছেন ইসব?

www.pathagar.com

ঃ কী কইলি?

রজব আলী ভাবল, মেয়েটি সম্ভবত চিনতে ভুল করে অন্য কেউ মনে করেছে। তাই খুব দ্ব্যর্থতার সাথে বলল, 'দ্যাইখ্যা বুইঝ্যা লউখান (দেখে এবং বুঝে লন)।'

ঃ থাপড়ে সব ক'টি দাঁত একেবারে পেটে ফেলে দিব কইলাম। বদমাশ কোথাকার! ইতর!

কী অপরাধ রজব আলীর, তা তাঁর জানা হয়নি। তবু সে এমনিতেই ছেড়ে দেবে কেন? সে গলা চড়াল,' এত চ্যাতাংগি দেহাইতাছেন (উত্তেজনা দেখাচ্ছেন) কারে? আমি কি আপ্নের তউল্যা নাহি (অধীনস্থ নাকি)?'

ঃ বেশী ভালো হবে না কিন্তু। বলছি, খাপ্পড় লাগিয়েই দিব। লজ্জা নাই? শরম নাই? আবার তর্ক করিস?

মেয়েটি পা থেকে স্যান্ডেল খুলতে উদ্যত হল। তা দেখে রজব আলীও তেড়ে এল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'এ্যাই ব্যাডি! এত খ্যার্খ্যারাইস্না কইলাম। তুই কেডা? তুই কেডা লো? কার ঘরের কেডা? ক' আমারে।'

মান-সম্মানের চিন্তা করে মেয়েটি মনে একটু হোঁচট খেয়ে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু রজব আলী কিছুতেই দমছে না। সে গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছে, 'গেরাম থেইক্যা আইলে কি অইবু? আমি তোর বাপের গাবর (চাকর) না।'

মেয়েটি গলার স্বর-নামিয়ে বলল, 'তুই কি?'

ঃ আমি যাঁর সাথে চলি, হ্যায় অইল (সে হল) গেরামের লেম্বর (মেম্বার)। এক্কেরে খাস সরকারের লোক। সরকারের খাতায় হ্যার (তাঁর) নাম আছে। খবরদার কইলাম! আমি যা-তা লোক না।

এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে ভদ্রমহিলারা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি দেখে রজব আলীর উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল। ততক্ষণাৎ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন এসে হাজির। তাঁরা ধরল রজব আলীকে। মহিলাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁরা রজব আলীর পাছায় দিল দুই বাড়ি। তাতে সে বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'স্যার গো! আমারে মাইরেন্না। আপনের পায় ধরি। আমার মা নাই-বাপ নাই। আমি এতিম মানুষ।'

ছাড়া পেয়ে রজব আলী একহাতে পায়ের স্যান্ডেল দুটো, আরেক হাতে ছাতা কোনো রকমে আঁকড়ে ধরে পাথালি পথে ভোঁ-দৌড়ে পালিয়ে ছুটে চলল। এ-দিক ও-দিক না-তাকিয়ে একদৌড়ে একেবারে উপজেলা অফিসের কাছে পৌঁছাল। সেখানে গেইটের কাছে ভেতরে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে গুটিসুটি হয়ে বসে

www.pathagar.com

পড়ল ঝপ করে। কী ঘটে গেল এটা তাঁর জীবনে, একাকী নীরবে বসে তা একটু ভাববে।

সামনের দিকে দুটো পা ছড়িয়ে পেছনে হাত দুটো ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে আছে রজব আলী। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা আমলকির চারা গাছের ডালে। আনমনা হয়ে শুধু ভেবেই যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে মনে ধরল, মেয়েদের সামনে লুঙ্গী উদলা করে টাকা বের করাই তাঁর কাল হয়েছে। সে-কারণেই মেয়েটা বলেছিল 'লজ্জা নাই! শরম নাই!' শহরের মেয়েরা কি তাহলে এ-রকমই হয়?

সময়ের পথে সময় যাচ্ছে চলে। কিন্তু রজব আলীর একটু নড়াচড়া নেই তাঁর জায়গা থেকে । বসেই আছে। আগের মতোই নিস্তব্ধ হয়ে। আকস্মিক ও অভাবিত এ-রকম ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার পর মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ছেলেমানুষি-ভাব। তোলপাড় করছে নানা জিজ্ঞাসা, শহরে মানুষ কি কারো ভূলচুক কিছু হলে কেউ কাকেও ক্ষমা করে না? আমার না-হয় ভূল একটা হয়েই গিয়েছিল। ওরা সেটা ক্ষমা করতে পারল না? শেষপর্যন্ত আমি ফৌজী লোকের হাতের বাড়ি খেলাম! বাপের বয়সী এক লোককে এই মার খাইয়ে ওদের কি লাভ হল? ওরা শহরের লোক বলেই আমাকে ক্ষমা করল না। তাহলে আমিও শহরের লোককে জীবনে কোনো দিন ক্ষমা করব না। দেখি, কোনো শালা আমার সাথে কোনো দিন ভূল করে কি না। তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে।

রজব আলী ভাবতে ভাবতেই ঘটনা। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এসে দ্রুত ঢুকছেন মিঠামইন উপজেলা দপ্তরে। রজব আলীর ছড়িয়ে রাখা পায়ে মৃদু ঠেস লেগে গেল। কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, ওহ্! sorry- sorry.

ব্যস, আর যায় কই? রজব আলী চোখ রাঙিয়ে লাফ দিয়ে দাঁড়াল। গলা চেঁচিয়ে বুকফাটা ক্ষোভ ঝাড়ল, 'আপ্‌নেরে যাইতে দিবাম না। সরি-মরি বুঝি না। পাও লাগানির বদলা পাও লাগানি চাই। আমারে কেউ খেমা করে নাই। আমিও কাউকে খেমা করবাম না।'

কর্মকর্তা বিস্মিত হয়ে গেলেন, এ-আবার কেমন পাগল? তিনি নিরাপত্তা প্রহরীকে ডাকলেন। প্রহরী এসে ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে বলল, 'এইডা নতুন পাগল স্যার। বেশী দিন অয় নাই খাতায় নাম ল্যাহাইছে।'

প্রহরী রজব আলীকে ঘাড়ধরে বের করে দিল। তাঁর কোনো কথাই শুনতে চাইল না।

www.pathagar.com

রজব আলী ব্যাথাভরা মনে বাড়ী রওয়ানা দিল। রোদের প্রখরতা নেই। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে গেছে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়ে চলেছে। দিন গড়িয়ে বেলা শেষের পথে। আসরের নামাজের আজান হচ্ছে। নৌকো পেয়ে গেলে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় পৌছে যাওয়ার ইচ্ছে।

গ্রাম্য পরিবেশের এই শহরে বিলের কিনারার পারঘাটায় তালের পিঠের ম ম গন্ধ এসে লাগছে নাকে। তাতে ব্যথাতুর মনে যেন ভিন্ন অনুভূতি দোলা দিতে চায়। ভালোয়-ভালোয় নৌকোও এসে গেছে। রজব আলী গোটানো ছাতায় ভর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে নৌকো চড়ে বসল।

ভট-ভট আওয়াজে ছুটে চলল নৌকো। নৌকোযাত্রী পাড়া-গাঁয়ের লোকজন নিজেদের ঘর-গেরস্থালীর খুটিনাটি থেকে শুরু করে আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, নানা বিষয় নিয়ে বকবক করে যাচ্ছে। নৌকোর ছইয়ের ভেতরে বসে খিড়কি দিয়ে চেয়ে আছে রজব আলী দূরপ্রসারিত হাওড়ের পানিতে। তাঁর মুখে কোনো কথা নেই আজ।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে নৌকো। রাত হয়ে গেছে বেশ। রজব আলীর ঘড়িতে আটটা বাজে। নৌকো থেকে নেমে নিজ বাড়ীতে না-গিয়ে আগে উঠল পাশের গ্রাম ওলীপুরে ধনু মেম্বারের বাড়ী। মেম্বার সাহেবকে দিনের ঘটনা খুলে না-বললে মনের দুখতাপ যাবে না।

এই এলাকার মানুষ রাতের খাবার সন্ধ্যারাতেই খেয়ে নেয়। ধনু মেম্বার খাওয়াদাওয়া সেরে খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আনমনা হয়ে চেয়ে আছেন অদৃশ্যের পানে। রান্নাঘরে থালা-বাসনের ঝন্‌ঝনানি শোনা যাচ্ছে। ছেলে-মেয়ে-মহিলা অনেকের খাওয়াদাওয়ার হইচই। রজব আলী এসে ঢুকল। পাশের জলচৌকিটাতে ঝপ করে বসে লম্বা একটা নিঃশ্বাস টানল। মেম্বার জানতে চাইলেন, 'মাষ্টর চাচা! এই আন্দাইরা রাইতে অবেলায় আইলা কি মনে কইরা?'

ঃ বিরাট ঘটনা একখান।

ঃ কী অইছে?

ঃ শউরে (শহরে) গেছিলাম। মিঠামইন। কি আর কইবাম! শরমের কথা। হগ্‌গলটা দিন (সারাটা দিন) কাটাইছি আইজ কুত্তা পাগল অইয়া। ফৌজী লোকের পিডা (পিটুনি) খাইছি। কিছ্‌মতের খাওয়া।

ঃ কী অইছিলো?

ঃ কইতে গেলে বউত (বহুত) কথা। ঠাডাপুরা রইদে (প্রখর রোদে) মাথা আছিলো আউলা। মিঠামইন শউরে ডেকিমারা বেডি কডা (বড়সড় মহিলা কয়টা)। কাপড়

www.pathagar.com

পিন্দে আধা লেংডা। আর উলাবুলা ছেড়ি (মোটাসোটা মেয়ে) একপাল। হ্যা গ লগে (তাদের সাথে) কাইজ্যা অইছে (ঝগড়া হয়েছে) আমার। মস্ত বড় লড়াই। পরে ফৌজী লোক আইয়া পিডাইয়া আমার ছাল তুইল্যা দিছে।

ঃ কাইজ্যা! হ্যা গো লগে? ফৌজী লোকও আইছিলো? বুইঝ্ছি। তুমি ছিনেমার মাগি গো লগে লড়াই দি আইছো। এমুন বেকুবি কাম মাইন্সে করে নাহি (মানুষ করে নাকি?) এ্যা? বখ্তের ভালা। তুমারে আট্কায় নাই।

রজব আলী ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করল। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

রজব আলী ক্ষোভের জোশে কথা বলেছে এতক্ষণ। এখন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাবার মতো মনে উদয় হয়েছে, খোলাখুলি সবকথা বড় আওয়াজে বলা ঠিক না। পাশের কক্ষে মেয়ে-ছেলে আছে। আছে বাড়ীর বয়স্ক মহিলারা। মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। কিন্তু তাঁরা যে ইতিমধ্যে অনেক কথা শুনে ফেলেছে। তাই কথা বলতে বলতে রজব আলী খানিক মিথ্যে বাহাদুরী জাহির করতে শুরু করল, 'যা-ই কও, ফৌজীরা বেকুব না। তাঁরা দ্যাইখ্যাই বুইঝ্যা ফ্যালাইছে, আমি কেডা। বুইঝ্লানা? পাছায় বাড়ি দুইডা দিয়া টেশ (ট্যাস্ট) কইরা বুইঝ্যে (বুঝেছে), আমি গেরামের লোকের লাহান আবাবুবা না (আলাভোলা না)। আমারে জিগাইলো (জিজ্ঞেস করল), কি নাম? আমি ছিনাডা টানাইয়া (বুকটা উঁচিয়ে) ব্যাটার লাহান এক্কেরে ডারেক (ডাইরেক্ট) জওয়াপ দিলাম, মুহাম্মদ রজব আলী মাষ্টর। তহন একজন ফৌজী আমার ছিনায় হাত ছাপড়া দি কইলো, সাবাশ! সাবাশ! আমি তহন মনে মনে হাসি। কও ছাইন দ্যাহি (বল তো দেখি), আমরা অইলাম বিদ্যাবুদ্ধি জানা লোক। সর্দারি করি। দ্যাশ-গেরামের মাথা যারে কয়। আমরা কি ডরাইন্যা পাবলিক নাহি (ভীতু জনসাধারণ নাকি)?'

দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য শোনার পর ধনু মেম্বার মুখ খুললেন, 'আপনি বাইচ্যা গেছেন (বেঁচে গেছেন)। দুইডা বাড়ি দিছে খালি। কেইস-মামলা দেয় নাই। বান্দ্যা (বেঁধে) জেলেও নেয় নাই। আপ্নি বিজ্ঞ লোক। খুব সুন্দর জওয়াপ্ দি আইছেন।

ঃ কও, আমি ছাড়া আম্গ গেরামের আর কেউ অইলে উপায় কী অইতু? ত্যাতাইলা-বেতাইলা (আবোল তাবোল) কিছু কইয়া সব্বনাশ ঘটাইতো না? তহন তুমি কি আর বইস্যা থাইক্তে পারতা? আমি পারতাম? চিন্তা কইর্ছো? তয়, আর কিছু না। মনে দুখ্খ একটাই। দোষ না-কইরা মাইর্ডা খাইলাম এক্কেরে হুদা (মারটা খেলাম একেবারে অনর্থক)।

ঃ দুখ্খের কিছু নাই। মাইর যেডা খাইছেন, হেইডা আপ্নের আযলের ল্যাহা (তকদীরের লেখা) আছিলো।

www.pathagar.com

রজব আলী নীরব হয়ে বসে আছে। কল্পনার পর্দায় ভাসছে সেই শ্বাসরুদ্ধকর সময়গুলোর নানা দৃশ্য। বেড়ার ওপারের কক্ষ থেকে মেম্বারের মাতা জমিলা খাতুন কথা ধরলেন, 'মাষ্টর মিয়া! তোমার আযলে (তকদীরে) আরও খারাপি আছে কইলাম। চরমো চউখ্যে না, গ্যানের চউখ্যে (চর্ম চোখে নয় জ্ঞানের চোখে) দ্যাইখ্যা কইতাছি। তোমার উপরে ভবানির মা'র শাপ আছে। ব্যাডিরে মার তুমি, তুমারে মারে জগতের মাইন্‌সে। আল্লাহ্‌র বিচার। এক্কেরে সোজা ইসাব (হিসেব)। বুইঝ্‌ঝ?'

ঃ এইডা কি কইন (এটা কি বলেন)? আমার বউ অইয়া আমারে শাপ দিবু ক্যাম্‌বায় (কেমনে)? হেইলার মুহে (তাঁর মুখে) এমুন কথা আইবো?

ঃ মুহে আইতে অয় না (মুখে আসতে হয় না)। যান্‌দারের দিল যুদি কান্দে (প্রাণীর অন্তর যদি কাঁদে), আল্লাহ্ তালার দরবারে হেইডাই বউত কিছু (বহুকিছু)। দিলের শাপ ফিরেনা। ঘরের রউরে ইজ্জত আর মব্বত (মহব্বত) করা অইল আম্‌গ দ্বীন-ইসলামের তরীকা। হেইডা না কইরা তুমি উল্টা কাম কর। মাইরপিট আর জুলুম কর বেডিরে। এইডা অইলো?

রজব আলী চিন্তিত হয়ে পড়ল। মুখে কিছু না-বললেও মেম্বারের মায়ের কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে তুলল খুব। রাত বেশী হয়ে গেছে। তাই রওয়ানা দিল বাড়ী অভিমুখে।

প্রতিদিন বাইরে থেকে গভীর রাত করে যখন রজব আলী বাড়ী আসে, তখন কাপড়-চোপড় পাল্টানো সেরে প্রথমেই ভাত চায়। কিন্তু আজ আসার পর তাঁর ভাত খাওয়ার গরজ নেই। কোনো সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। ভবানির মা ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছে।

আশ্চর্য লাগছে ভবানির মা'র। এতক্ষণ ধরে বেচারা আসছে না কেন? ঘটনা কি? মুখে ডাক না-দিয়ে কুপি বাতি একটা হাতে নিয়ে নিশ্চুপ খুঁজতে লাগল সারা ঘর তন্ন তন্ন করে। বারান্দাও দেখল। কোথাও পাত্তা নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল, ঘরের উত্তর প্রান্তে ধানের গোলার আড়ালে তাঁর স্বামী অন্ধকারে গালে হাত দিয়ে একটা মুগুরের ওপর বসে আছে।

বাতির আলো দেখে রজব আলী ভবানির মা'র দিকে মলিন মুখে তাকাল একবার। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের মতোই ঝিম মেরে বসে রইল। চোখ দুটো লাল। কোনো কথা বলছে না। ভবানির মা আড়ষ্ট পায়ে পিছিয়ে চাউলের মটকার আড়ালে এসে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে নাছোড়া বান্দার মতো নীরবে বাতি হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

দু'জনেই নীরব। কেউ কাউকেই কিছু জিজ্ঞেস করছে না।

দেখতে দেখতে রজব আলী মুখ খুলল। বিরক্তির সাথে ফ্যাসফ্যাসে হালকা স্বরে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করল, 'চুফি দি কি দ্যাহস (উঁকি দিয়ে কি দেখছিস)? আমারে দ্যাহস নাই জীবনে?'

ঃ আপনের আইজ্যা খাউন (খাওন) লাইগ্‌বুনা?

ঃ যা। আইতাছি।

ভবানির মা চলে আসতে লাগল। রজব আলী একাকী বিড়বিড় করে বলল, 'তোর বখ্‌তডা আইজ্যা ভালা (ভাগ্যটা আজ ভালো)। আমি মন বাইন্‌দ্যা লইছি (বেঁধে নিয়েছি), আর মাইরপিট করবাম না। না-অয় দ্যাখ্‌তি।'

গভীর রাত। রজব আলী চুপচাপ এসে খেতে বসে গেছে। মাটির শানকিতে গোটা কয়েক লম্বা আলু। পাশে পোষা বিড়াল। সামনের দিকে ভবানির মা হাঁড়ির পাশে বসা। কোনো কথা না-বলে রজব আলী চপচপ করে খেয়ে চলেছে।

রজব আলীর কথা মিথ্যে নয়। ভবানির মা'র বখ্‌ত আজ ভালো। না-হয় হিসেবমতো আজ তাঁর আচ্ছারকম পিটুনি খাওয়ারই কথা। কারণ বাইরে কোথাও কারো সাথে রজব আলীর ঝগড়া হলে কিংবা যে কোনো কিছুতে মানসিকভাবে পরাজিত বা বিপর্যস্ত হলে ঘরে এসে গোস্‌সা ঢালে সব ভবানির মা'র ওপর। এই গোস্‌সা ঢালার আবার বিভিন্ন পরিমাণ বিন্যাস আছে। সবচেয়ে নিম্ন পরিমাণটি হচ্ছে ঝাঁঝিয়ে কথা বলা। সেটা এক স্তর বাড়লে শোনা যাবে ভবানির মা'র সাথে কথায় কথায় বকাঝকা। আরো যখন বেড়ে যাবে, তখন ভবানির মা গোটা তিনেক লাথি অথবা তামচা অথবা এই উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে। গোস্‌সা ঢালার পরিমাণ সর্বোচ্চ বিপদ সীমা ছাড়িয়ে গেলে শুরু হবে বেদম পিটুনি।

এই নিয়মটা রজব আলীর নতুন নয়। বহু দিনের পুরনো। সে-নিয়ম অনুসারে আজ ভবানির মা বেদম পিটুনিই খেত। আজ রজব আলী একদিকে নিজে পিটুনি খেয়ে এসেছে। কাউকে দায়ী করতে পারে নি। মনের ক্ষোভ প্রকাশের জায়গা পায় নি। তার ওপর আবার ভবানির মা শুরু করেছে অদ্ভূত জিজ্ঞাসার বকবকানি, মানুষ কেন তাঁদের ভাটি অঞ্চলের লোক বলে থাকে। সেই সাথে লম্বা আলু পাতে নিয়ে মেজাজ গেছে আরো বিগড়ে। পুরো ব্যাপার রজব আলীর মতো লোকের মাথার আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখন ভবানির মাকে ধরে পিটিয়ে একেবারে লাশ বানাতে পারলে হয়তো এ আগুনের উত্তাপ কিছুটা কমতে পারত।

কিন্তু ভবানির মা পিটুনি খায় নি। রজব আলী শুধু খিঁচিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে গেছে। কারণ মেম্বারের মায়ের কথায় তাঁর মন তোলপাড় হয়ে ঘুরে গেছে।

www.pathagar.com

ফিরে এসেছে সুমতি। ভবানির মাকে আর মারপিট করবে না। মেম্বারের মায়ের মতো এ-রকম সুবচন কেউ কোনো দিন শোনায় নি রজব আলীকে। শোনায় নি আল্লাহ-রাসুলের কথা।

রজব আলীর জ্ঞানের অভাব। জীবনচলার প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞান তাঁর নেই। উপযুক্ত জানার অভাব আছে তাঁর। এই না-জানার দায়ভার কে নেবে? রজব আলী একা? নাকি সমাজ? না রাষ্ট্র নেবে?

॥ ৮ ॥

গোটা দশেক দিন হয়ে গেছে কার্তিক মাসের।

ভবানির মা'র কাছে জগত-সংসারের ভাব-গতিকটা সুখকর লাগছে না। এক সপ্তাহ ধরে 'কাইত্তানি' নেমেছিল। আজ দু'দিন হল আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। বাতাসে শীতের ছোঁওয়া। কিন্তু মানুষের মনে আতংক বিরাজ করছে, এখন কাইত্তানির উপদ্রব শুরু হবে।

বর্ষা-বাদলের সকল রেশ কাটিয়ে এখন কার্তিক মাসে শুকনো মওসুম শুরুর কথা। সামনে শীত। এমন দিনে অভাবনীয় ঝড়-বাদল বড়ই দুর্বিষহ। কার্তিক মাসে অসময়ের এই ঝড়-বাদল কাইততানি নামে পরিচিত। নানা অলীক ধারণা, কুসংস্কার আর কল্পকাহিনী রয়েছে প্রচলিত এই কাইততানিকে নিয়ে।

কাইততানি নামলে জীবন-যাত্রার স্বাভাবিক গতি ভিন্নরূপ লাভ করে। এখন হাওড়-বিল থেকে বর্ষার পানি শুকিয়ে যাওয়ার সময়। শুরু হবে পরবর্তী এক বছরের ধানচাষের প্রাথমিকপর্ব। হাড়ভাঙ্গা খটাখাটনির জমকালো সমারোহ।

এখনই হাওড়ের শুকনো জমিনে আইল বেঁধে পানি সেচে বীজতলার নরম কাঁদামাটিতে করতে হবে জালা বাইন। ধানের বীজ বপন করার নাম জালা বাইন করা।

এলাকার গেরস্থদের আয়-উপার্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে ধান চাষাবাদ। ধান উৎপাদন হয়ে আসে বৎসরে মাত্র একবার। বৈশাখ মাসে। আর সে-ধান ফলিয়ে আনার মূল কাজটাই শুরু এই কার্তিক মাস থেকে। তাই এই মাস যেন পরবর্তী এক বৎসরের জীবনযাত্রার নতুন হিসেব-নিকেশের সু-সংবাদ নিয়ে আসে এখানকার মানুষের ঘরে ঘরে। যেন কার্তিকই বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস। বৈশাখ নয়। নানা আচার-অনুষ্ঠানের ভাবনা-চিন্তা করতে অনেকের মাস-বছর হিসেবে করতেও তাই দেখা

www.pathagar.com

যায়। কার্তিক মাস থেকে শুরু করেন।

এরকমই এখানে কার্তিক মাসের গুরুত্ব। এ মাসে ঝড়-বাদল নামলে হাওড়-বিলের পানি শুকানোর সময়কাল বিলম্বিত হয়। ধান চাষবাস পুরো এলোমেলো করে দেয়। এমন সময়ে কাইততানি দেখলে কে না-বিচলিত হবে! তাছাড়া আবহাওয়া আর পরিবেশেও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। দেখা দেয় নানা রকম অসুখ-বিসুখ। অপরদিকে কাইততানির ঝড়-বাদলের প্রচন্ডতা থাকে তীব্র। ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। লোকজন সতর্ক চলাফেরা করে। একান্ত প্রয়োজন না-হলে কেউ ঘরে থেকে বেরোয় না। মুরব্বীরা বলে গেছেন,

কাইততানির ঝড়ে
কাউয়া- বগ্‌ও মরে।

কাক আর বক পর্যন্ত মরে যায়। মানুষ তো মরবেই। কিন্তু রজব আলী এ-নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাইততানির বাদলেও তাঁর বাউন্ডুলের মতো ঘোরা ঠিক আছে। যে-কয়দিন বাদল ছিল, তখন লুঙ্গী কাছা দিয়ে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। যেন না-গেলে কোথাও মহাসর্বনেশে কিছু ঘটে যাবে।

আজ রজব আলীর শরীরটা ভালো লাগছে না। ক'দিন ধরেই বুকে চিন চিন ব্যথা। মাথায় প্রচন্ড ধরা। এখন কিছুক্ষণ পর পর চোখ শুধু আঁধার হয়ে আসছে। হাঁটাচলা-কথাবার্তা - সব অসহ্য লাগছে। ঘরে ফিরে কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে মন চাচ্ছে। কাইততানি ধরে ফেলল কি না কে জানে! রজব আলীর এই আকস্মিক অসুস্থতা আরো যেন বেড়ে গেল মানসিক আতংকে।

সন্ধ্যারাত। শরতকালের মতো কালচে নীল রঙের আকাশে সোনালী আলো চাঁদের। দীর্ঘ কাইততানির পর নতুন মেঘমুক্ত আকাশ দেখতে খুব ভালো লাগছে রজব আলীর। অসুস্থ শরীরে মনে হচ্ছে চাঁদের আলোটাই একমাত্র নির্মল। সকল প্রকার কোলাহলমুক্ত। কোথাও দেরী না-করে ধীর-পায়ে রওয়ানা দিল সে বাড়ী। হাঁটতে স্বস্তি লাগছে না মোটেও। মনের গতি আজ অন্যরকম। হাঁটতে হাঁটতে বড় বেশী মনে পড়ছে ভবানির মা'র কথা। তিনপুত্রের কথা। কে কোথায় আছে? এখন কে কি করছে? এই সব।

এ-দিকে ভবানির মা এই সময়টাতে প্রতিদিনকার মতো রান্নাকাজ নিয়ে ব্যস্ত। জজ মিয়া, দারোগা মিয়া আর ঝাড়ু মিয়া-সকলেই বাড়ীতে। কাইততানির ভয়ে কেউ কোথায়ও বের হয়নি।

www.pathagar.com

কাইততানির আবার হাত পা আছে। চোখে দেখা যায় না। আছে বড় বড় ডানা। সে বাতাসে ভর করে এক গেরাম থেকে অন্য গেরামে চষে বেড়াতে পারে। এ-সব কথা মুরব্বীরা বলে গেছেন।

ঘরের বাইরে দেউড়ীর পাশে মাটির চুলো। ভবানির মা একাকী। তাঁর রান্নাকাজ শেষ হতে আরো অনেক বাকী। অন্য সময় পাড়াপড়শীরা আসেন। আজ কেউ আসে নি। মাগররিবের নামাজের পর পরই সারা এলাকা একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। নেহাত দরকার না-হলে কেউ ঘর থেকে খুব একটা বেরোতে চায় না। ভবানির মা'র মনে ভয় ঘোঁট পাকাচ্ছে, কখন জানি দূরে কোথাও চাঁদের আলোতে কাইততানির মুখ ভেসে ওঠে। আশপাশের জায়গা চাঁদের আলোতে গাছ-গাছালির ছায়ার অন্ধকারে ঢাকা। একেবারে সুনসান নীরব সব কিছু। একটা পশু-পাখী পর্যন্ত রা-কাড়ছে না। শেয়ালের পালের হুক্কা-হুয়া ডাক আর কুকুরের উগ্র মেজাজী ঘেঁউ ঘেঁউ শাসানিও বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি? কাইততানির ডর তাদেরও আছে। পাশের বনকলমি ঝোপ থেকে একটা কানি বকের খ্যাঁক-খ্যাঁক গলার আওয়াজ আসছে। বকটা অসুখে পড়েছে। হয়তো কাইততানির দাবড়ে পড়েছিল। দাবড়ে পড়তে হয় না। গায়ে বাতাস লাগলেই হয়। ওই বকটা তাহলে মারা যাবে নির্ঘাত। এখন অনিবার্য কারণে কাইততানি যদি এই এলাকা দিয়ে এই মুহূর্তে চলাচল করেই বসে, তাহলে কি হবে? তাকে দেখামাত্র চিৎকার দিয়ে পাড়ার মানুষ জড়ো করার আগেই কি প্রাণ বেরিয়ে যাবে না ডরের তাড়শে? মেয়ে-মানুষদের কি আর পুরুষদের মতো শক্তি-সাহস আছে?

ভবানির মা মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারের মানসে আল্লাহ্‌র নাম নিতে চাইল। কিন্তু এ রকম মুহূর্তে আল্লাহর নাম কী পাঠ করতে হয়, তা তাঁর জানা নেই। তাই বড় করে আওয়াজ করার জন্যে পাশের বাড়ীর আব্দুল কাদেরের কচি মেয়ে নাছিমাকে টানা-আহ্লাদি কণ্ঠে ডাকতে শুরু করল, 'নাছিমা গো! ভাত খাইছো নি গো! ও নাছিমা! বড় বাপের ঝি গো! .....?'

রাতের বেলা একাকী ভয় লাগলে মানুষ মুখে বড় করে আওয়াজ করলে মনে সাহস হয়। যতক্ষণ মুখে এই আওয়াজ থাকে, ততক্ষণ ভয়ও দূরীভূত থাকে।

কিন্তু অকারণে আর কতক্ষণ একটানা ডাকপাড়া যায়? ভবানির মা মুখ বন্ধ করল। কিন্তু মনে কেবল কাইততানির কথা আর নানা অজানা ভয় কিলবিল করে। ছোটবেলায় শোনা *আলাল দুলালের পালার* যে কয় লাইন মনে আছে, তা-ই আওয়াজ করে বেসুরো গলায় গাইতে লাগল-

www.pathagar.com

সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া,
আমি নারী মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিয়া.... ।

আগেকার দিনে গ্রামের কোনো কোনো লোকজন পালাগানের আয়োজন করত। এ-নিয়ে বড় আসর জমত। দূর-দূরান্তের নানা জায়গা থেকে 'গাইন' আনা হত দাওয়াত দিয়ে। গাইন স্থানীয় শব্দ। এর অর্থ গায়ক। *আপন দুলাল, গাজী কালু চম্পাবতী, মলুয়া, কুড়াশিকারী বিনোদের জারি, মহুয়া-* এইসব পালা বেশী প্রচলিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো পালার মধ্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারারও নানা সংমিশ্রণ লক্ষ করা যেত। এ-নিয়ে অনেকে সমালোচনাও করতেন। তাছাড়া আসরে থাকত নাচ-গানের আয়োজন। অনেক সময় ঘটত নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। এলাকার বড় আলেমরা এ-সব আয়োজন কিছুতেই পছন্দ করতেন না।

ভবানির মা ছোটবেলায় অনেক পালাগানের আসরে গিয়েছে। সব স্মৃতি মনে আছে তাঁর। আজকাল পালাগানের আসর জমতে শোনা যায় না বড় বেশী।

সেই অতীত স্মৃতি মনে করে ভবানির মা খানিকটা অন্য মনস্ক হয়ে এক হাতে লাকড়ি ঠেলছে রান্নার চুলোয়। আরেক হাত গালে ঠেস দিয়ে রেখেছে। মুখে উচ্চ আওয়াজে গান।

রজব আলী কাছে এসে গান শুনে আড়াল থেকে কান পাতল। আজই প্রথম শুনেছে ভবানির মা'র গলা। সে বিমোহিত হয়ে গেছে। গানের লাইন দু'টির কথাও তাঁর মনে রেখাপাত করছে দারুণভাবে। স্ত্রী ভবানির মা তাহলে মনে মনে এ-রকম চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর স্বামীকে নিয়ে। খুব ভালো লাগল তাঁর।

আরো কিছু সময় দাঁড়িয়ে শোনার ইচ্ছে ছিল রজব আলীর। কিন্তু অসুস্থতা তাকে শুনতে দিল না। চোখ আঁধার হয়ে মাথা ঘুরছে। কয়েক পা এগিয়ে কোনো রকমে দেউড়ীর কাছে এসেই ঝপ করে বসে গেল মাটিতে। আকুল কণ্ঠে ডাক দিল, 'আলাতন! আমারে ধর। আমি পইড়া গেলাম।' এ-পর্যন্ত বলেই আর কোনো কথা বলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ভবানির মা'র গগন-বিদারী কান্নার রোল শুনে পড়শীরা দৌড়ে এল। রজব আলীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল ঘরে।

পাড়ার লোকে ভরে গেছে রজব আলীর ঘর। বাইরে উঠোনেও লোকজনে ঠাসাঠাসি। রজব আলীর ভাই-ভাতিজারা বলছেন, 'কাইল্যা (আগামীকাল) ভানু ডাক্তর লইয়া আইতে অইবু।'

www.pathagar.com

এই এলাকার কয়েক গ্রামের মধ্যে একমাত্র 'ডাক্তার' হলেন উজীরপুরের ভানুর বাপ। অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারী-শিক্ষক। বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের নাম তাঁর জানা। বাড়ীর পাশে টং দোকানে ওষুধ বিক্রি করেন। সপ্তাহ-তিনেক পর পর বাজিতপুর গিয়ে ওখানকার একটা ফার্মেসী থেকে ওষুধ নিয়ে আসেন। ওষুধের তালিকার মধ্যে রয়েছে একপাতা প্যারাসিটামল। আর একপাতা মেট্রোনিডাজল জাতীয় ট্যাবলেট। এলাকার লোকজনের কাছে একটা-দুটো করে ট্যাবলেট বিক্রি করেন চড়া দরে। প্রথম ওষুধটা জ্বর, মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে সমগ্র শরীরের পীড়াদায়ক সকল রোগে। আর দ্বিতীয়টা পেটের যত সমস্যা আছে, সব সমস্যায়। এককথায় পেটের যাবতীয় রোগের এজমালী ওষুধ। একই সাথে কবিরাজী ওষুধের পুরিয়াও বিক্রি করেন।

এখন রাতেরবেলা উজীরপুর যাওয়া যাবে না। তরীকপাশা থেকে পশ্চিমে একেবারে পাকা ছয় মাইল। পৌঁছাতে লাগবে দীর্ঘ সময়। পরে গভীর রাতে সে-লোক বাড়ী থেকে বেরোবে না। পথে ডাকাতের উপদ্রব আছে।

রজব আলী অজ্ঞান হয়ে বিছায় পড়ে আছে। তাঁর মাথায় এ-পর্যন্ত দশ কলসী পানি ঢালা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান ফেরে নি। ভবানির মা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে কান্নাকাটি করছে।

এ-দিকে খবর যত ছড়াচ্ছে, লোকজনের ভীড় ততই বেড়ে চলেছে। কারণ এই সময়টাতে সবাই বাড়ী-ঘরে। বাইরে নেই কেউই। চাষাবাদের সময় ছাড়া দূরে কোথাও যায় না কেউ। সেই সাথে কাইততানির ডর তো আছেই। কোথাও কিছু ঘটেছে শুনলে মুহূর্তে পিঁপড়ের পালের মতো জড়ো হয়ে যায় সকলে।

রজব আলীর বাড়ীতে জড়ো হওয়া সকলের মুখে একই কথা, 'কাইততানি ঘটাইছে কামডা।' কেউ কেউ বলছে 'অহন কাততিশাইল ধানের জাউ কইরা কাইত্তানিরে ভোগ দিতে অইবু।'

বড়ভাই মহররম আলীর মতামত হচ্ছে, 'কাইল্যা বইর বিয়ানে (আগামীকাল খুব সকালে) ভাউন্যা ডাক্তইরারে আইন্যা (ভানু ডাক্তারকে এনে) আগে ওষুধ করাই লই।' কিন্তু অনেকের তাতে দ্বিমত, 'লক্ষণে ত কইতাছে শত্রু বান মারছে। উপরি (ভৌতিক) আছরও অইতে পারে। হেইকাম ঘইট্যা থাইকলে (সে-কাজ ঘটে থাকলে) ডাক্তর আইন্যা লাভ অইবু? যইগ্যা ঠাকুররে খবর দ্যাও। হ্যার (তাঁর) হাতযশ আছে। ফুঁ খুব কামের (কার্যকরী)। বান-আছর অইলে চউখ্যের পলকে কাইট্যা ফাইবু (চোখের পলকে কেটে যাবে)।'

www.pathagar.com

বাড়ীর বয়স্ক মহিলারা শোরগোলের মধ্যে নেই। বড় বড় হাসপাতালে মেডিক্যাল বোর্ড বসার আদলে তাঁরা কয়েকজন পৃথক এক জায়গায় নিরিবিলি বসলেন। পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, 'যে যা-ই কউক, এইডা আকাইল্যা জ্বর। কালা ধলা পাঠা আইন্যা চালান দিতে অইবু।'

লোকজন গভীর রাত অবধি অবস্থান করে অসংখ্য মন্তব্য আওড়িয়ে একে একে চলে গেল যে-যাঁর পথে।

সকালে রজব আলীর জ্ঞান ফিরল। এক হাত ও এক পা অবশ। মুখও সামান্য বেঁকে গেছে।

বিকেলবেলা যইগ্যা ঠাকুরের ফুলপড়া এনে দেয়া হল। ত্রিসন্ধ্যায় শুঁকতে হবে। প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যহ্ন আর সায়ংকালে মন্ত্রপড়া ফুলটি রোগীকে চোখবুজে তিনবার শুঁকতে হবে। এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত।

দিন তিনবেলা রজব আলীকে ধরে ফুল শোঁকানো হয়। প্রত্যেক দিন একই ফুল নাকে শুঁকতে কূট গন্ধ লাগে। রজব আলী আপত্তি জানায়। কিন্তু কেউ তা শুনতে চায় না। একযোগে সকলে উপদেশ ছুঁড়ে।

ধনু মেম্বার এলেন আট-দশ জন লোক সাথে নিয়ে। ইতিমধ্যে রজব আলীর বিনে চিকিৎসায় কেটে গেছে পাঁচ দিন। তাঁর আকুতি শুধু একটাই, যেমন করেই হোক অবশ হাত আর পা'টা ভালো করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় যেন।

মাছধরার পলোর ভেতর বিছানা পাতিয়ে রজব আলীকে তোলা হল তাতে। তারপর নৌকোতে নিয়ে তুলে মেম্বার রওয়ানা দিলেন কিশোরগঞ্জের পথে। সেখানকার বড় ডাক্তারের কাছে। হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে ভবানির মাও উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলল সকলের সাথে।

ইসিজি, ইটিটি আর প্রশ্রাব, রক্ত, কপ-সব মিলিয়ে সাত প্রকারের টেষ্ট। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিলেন। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল আর সিরাপ মোট এগারো আইটেম। রোগীর ষ্টমাক ড্যামেজ। ছোটখাটো ষ্ট্রোকও হয়ে গেছে। এক হাত ও এক পা ভালো হতে সময় লাগবে। তবে ষ্টমাকের সমস্যা মারাত্মক হওয়ায় বাঁচার লক্ষণ ক্ষীণ।

দিন সাতান্ন টাকার ওষুধ লাগে। দু'দিন খাওয়ার পর রজব আলী ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিল। রোজ রোজ এত টাকা খরচ? তবে তো জমিদারের জমিদারীতেও কুলোবে না। অতএব হিসেব করে চলতে হবে। রজব আলী -দু'দিন ফাঁক দিয়ে ওষুধ সেবন করতে লাগল। পুষিয়ে খেতে হবে। যাতে নতুন করে আবার না-কিনতে হয়।

www.pathagar.com

এক কেনাতেই সেরে যায় অসুখ। ভবানির মাও একমত। কারণ টাকা-পয়সা কি আর গাছে ধরে? ওষুধ করার জন্যে শহর-বন্দরের মানুষদের মতো বাতাসে টাকা ওড়ানো যায় না। তারচেয়ে বরং ভানু 'ডাক্তর'ই ভালো ছিল। গেরামের মানুষ। গেরামের মানুষের অবস্থা বোঝে।

কিশোরগঞ্জের বড় ডাক্তারের ওষুধ পুষিয়ে খেয়ে খেয়ে রজব আলীর দিন কাটতে লাগল। ঘরে পড়েছিল কার্তিক মাসে। তারপর অগ্রহায়ণ আর পৌষ গেছে। পাড়া-পড়শী অনেকে বলেছিল, শীত না-গেলে উন্নতি বোঝা যাবে না। শীত চলে গেছে। মাঘ, ফাল্গুন আর চৈত্র মাসও শেষ হয়ে বৈশাখ এসেছে। পুষিয়ে খাওয়া ওষুধ শেষ হয় নি। উন্নতিও হয় নি রজব আলীর শারীরিক অবস্থার।

রজব আলীর সারাদিন-সারারাত কাটে বিছানায় শুয়ে। দিনের বেলা বাইরের আলো দেখার সুযোগ হয় বেশকিছু সময়। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার আগ পর্যন্ত উঠোনের একপাশে গাছের ছায়ায় এনে রাখে তাকে ভবানির মা। শরীর শুকিয়ে হাড়জিরজিরে। ভবানির মা পাথালিকোলা করে তাকে ঘর-বাইর করে। কোনো দিন শোয়ার জায়গা করে দেয় বারান্দায়।

বৈশাখ মাস আসার পর থেকে স্বামীকে আর ঘরের বাইরে নেয় না ভবানির মা। ঘরের বারান্দায় এনে রাখে। কখন জানি বৃষ্টি-বর্ষণ শুরু হয়। কিংবা ঝড়-তুফান নামে! না কি 'বইশাগ্যিয়া কাল' পেয়ে বসে, সে-আতংকে। বছরের এ-সময়টাতে ঘরবাড়ী লন্ডভন্ড করে দেয়া কালবৈশাখীর ঝড়-তুফান 'বইশাগ্যিয়া কাল' নামে পরিচিত। আবাল- বৃদ্ধ- বণিতা সকলে ভয় পায় একে। দিন কাটায় চরম আতংকে। কার ঘরবাড়ী যাবে, কার হাত-পা ভাঙবে না প্রাণ যাবে- আতংকে অনেকের ঘুম-খাওয়া ঠিকমতো হয় না। বচন আছে,

আইছে আবার
বইশাগ্যিয়া কাল,
লইয়া যাইবু
জান-মাল।

ভবানির মা ঝড়-তুফান ভয় করে যত, তার চেয়ে বেশী ভয় বইশাগ্যিয়া কাল নিয়ে। আকাশে সামান্য কালোমেঘ দেখলেই তাঁর মুখ ফ্যাকাশে-বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সনের পয়লা তারিখে নাপিতবাড়ীতে পূজো ছিল। ঢাক-ঢোল পেটানোর আওয়াজ শোনা গেছে। আনন্দ-উল্লাস হয়েছে। অনেকে গিয়েছিল তামাশা দেখতে। ভবানির মা যায় নি। 'কাল' এর আগমনে আনন্দ আর তামাশা উপভোগ আবার কিসের?

www.pathagar.com

আল্লাহ্- আল্লাহ্ করে পানাহ্ চাওয়া ছাড়া উপায় আছে?

বইশাগ্যিয়া কাল নাকি আবার কাইততানির সহোদর ভাই লাগে। ছোটবেলা থেকেই সে খালি ভাংচুর করত আর মানুষ মারত। তাই তাকে ধরে মা-বাবা কল্লা কেটে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বইশাগ্যিয়া কাল মাথাকাটা দৈত্য নামেও পরিচিতি লাভ করে। সাত সমুদ্র-তেরো নদীর ঘাটে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকে সারা বছর। একহাতে মানুষ ডাকে। আরেক হাতে যেতে নিষেধ করে। যাঁরা তাঁর নাগালের কাছ দিয়ে গমনাগমন করে, তাঁদের ধরে ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত পান করে নেয় সে। বছরে একমাস অর্থাৎ বৈশাখ মাসটাতে সে গাওয়ালে বেরোয়। ঘুরে বেড়ায় গাঁয়-গাঁয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রজব আলীরও আতংকের শেষ নেই, কখন জানি ঘরবাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায় বইশাগ্যিয়া কাল ! নাকি গাছগাছালি-ডালপালা ভেঙ্গে কাউকে আহত না-হয় নিহত করে। অসুস্থ হওয়ার আগে তাঁর এ -রকম আতংক ছিল না।

রজব আলীর চিন্তা আর অনুভূতিও আজকাল অন্যরকম। প্রথম-প্রথম পাড়া-পড়শীরা দেখতে আসত। কথাবার্তা বলত। কিন্তু নিত্যরোগী হওয়ায় আজকাল আর কেউ দেখতে আসে না। এ-জন্যে খুব পীড়াবোধ করে সে। দীর্ঘ একঘেঁয়েমির যন্ত্রণা হয় মনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, অসুস্থ না-হলে সুযোগ হত না জীবন ও সংসারের ভিন্ন রূপটা দেখার। এই ভেবে মনকে শান্তনা দিতে চেষ্টা করে।

॥ ৯ ॥

ভবানির মা'র শরীরের নানা অংশ উদলা থাকে। চলাফেরা-কাজকর্মে, সবসময়। পরনের কাপড় থাকে দলানো। ফলে পেট, বুক ও পিঠের দুপাশ থাকে খোলা। এ-বাড়ীর জোয়ান-বুড়ী সব নারী এ-ভাবে কাপড় পরে। পুরো শরীর কেউই ঢাকে না। ব্লাউজও কেউ পরে না। ভবানির মা'র ব্লাউজ যে নেই, তা নয়। ঘরে যে কাঠের সিন্দুক আছে, তাতে গাঁটুরীর ভেতর একটা ব্লাউজ দুমড়ে-মুচড়ে গুজে রাখা আছে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বেড়ানো উপলক্ষে বছরে দুয়েকবার গায়ে ব্লাউজটা পরে ভবানির মা। নমাসে-ছমাসে একবার বাপেরবাড়ী গেলেও পরে। খবু গরম লাগে তখন। একটু-একটু অস্বস্থিবোধও করে।

ভবানির মা জানে, সারা শরীর ঢেকে রাখে জমিদারবাড়ীর ব্যাটিরা। তাঁদের দিন যায় আটপৌরে জুতো পায়ে। গেরস্থবাড়ীর বউয়ের উদলা শরীর লোকে দেখলে দোষের কিছু না। এ-নিয়ে ভাবার কিছু নেই। কিন্তু মুসলমান নারীকে পরপুরুষের কবল থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে হয়। সারা শরীর ঢেকে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

পর্দা করা নামাজ-রোজার মতোই ফরজ। সেটা ভবানির মা'র জানা হয় নি জীবনে। কেউ জানায় নি কখনো।

সকালবেলা। ভবানির মা উঠোনের একপাশে লাকড়ি কাটছে। গাছের ডালপালার লাকড়ি। কাটা-লাকড়ি একটু দূরে রাস্তার পাশে নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে রোদে শোকানোর জন্যে। রজব আলী ঘরের বারান্দায় হোগলার পাটিতে বিছানো ছেঁড়াখুঁড়া একটা কাঁথার ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে। শিশুর মতো তাকিয়ে দেখছে স্ত্রীর কাজ-কামের দৃশ্য। অসুস্থ হওয়ার পর প্রতিদিন সকালবেলার সময়টা উঠোনের দিকে তাকিয়ে এ-ভাবেই কাটায় রজব আলী। আজ নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভবানির মা যখন দা দিয়ে লাকড়িতে কোপ দিচ্ছে, হাত দোলাচ্ছে, তারপর উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং লাকড়ির আঁটি ঝাপটে ধরে হাঁকিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তখন বড় দৃষ্টিকটু লাগছে দেখতে। কারণ বুকের দু'পাশটা বস্ত্রহীন। দু'হাতের রান একদম কাঁধ পর্যন্ত উদোম। নড়াচড়ার ফাঁকে ঝিলিকের মতো বার বার কাপড়ের আড়াল থেকে ভেসে উঠছে শরীরের ঢাকা অংশের পার্শদৃশ্য। তা দেখে নিজের সম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগছে রজব আলীর। কিছু না-বলে সে কতক্ষণ পর পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টানছে। আপত্তি জানাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কী বলে জানাবে? কাজকর্মও তো চালাতে হবে। না-হয় সংসার চলবে না। তাঁর বউ কি আর জমিদারের বিবি যে সমস্ত অঙ্গে কাপড় শোভা পাবে? গেরস্থবাড়ীর বউ পায়ের ওপর পা তুলে চলছে দেখলে পাড়াপড়শী বলবে কি?

শুয়ে শুয়ে রজব আলী খুব বিস্ময়বোধ করছে। অন্যরকম উৎকণ্ঠাও মনে। কাজে ব্যস্ত ভবানির মা'র কাছে এসে নানা লোকে গায়ে পড়ে অহেতুক নানা কথা বলছে। একান্ত আপনজনের মতো কুশলাদি জিজ্ঞেস করছে। আর চোখ ঘুরিয়ে বার বার তাকাচ্ছে ভবানির মা'র মেয়েলি-কোমল শরীরের উদলা অংশে। ব্যাপারটা স্বামী রজব আলীর খুব বিরক্তি উদ্রেক করছে। কারণ এ-জাতীয় চাওয়া-চাওয়ির রহস্য সে ভালো বোঝে। এ-কাজে সে নিজেও একসময় ওস্তাদ ছিল। এ-নিয়ে কেলেংকারীর ঘটনা আছে তাঁর জীবনে দু'চারটা।

যে যা-ই জিজ্ঞেস করুক, ভবানির মা কারো সাথেই কথা বাড়াচ্ছে না। অনেকের কথার জবাবও দিচ্ছে না। ধ্যান-মগ্নের মতো টানা-কাজ করে যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে জাইল্যাবাড়ীর শিবু যাচ্ছে। রজব আলীর বাল্যবন্ধু। ভবানির মাকে দেখে ঠাট্টার ছলে বলেই বসল, 'কি গো ভবানির মা! শইল্‌ডা ক্যামুন (শরীরটা কেমন)? তোমার ভাঙ্গা নাও আর কদ্দিন (কতদিন) দৌড়াইবা? ভাইব্যা চিন্তাইয়া

www.pathagar.com

দ্যাহো (ভেবে-চিন্তে দেখ) আম্‌গ (আমাদের) দ্যাখ্‌তে পছন অয়না (পছন্দ হয় না)?'

শিবু মুখে কথা বলছে আর চোখ দুটো তাঁর ঠিকরে পড়েছে ভবানির মা'র উদলা রানে। খানিক পর চোখ ঘুরিয়ে তেরচাভাবে তাকাচ্ছে বুকের দলানো কাপড়ের নীচে। রজব আলী দূরে থেকে বিছানায় শুয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখে চলেছে সব।

ভবানির মা নীচ দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে জবাব দিল, 'দুইন্যাইডাতে হগ্‌গল মাইনসেরে (দুনিয়াটাতে সকল মানুষকে) একপাল্লায় মাপুন ঠিক্‌না।'

ঃ কি, ব্যাজার অইলা নাহি (বিরক্ত হলে নাকি)?

ঃ না ত খুশী অইবাম? আমার সোয়ামীরে (স্বামীকে) আপ্‌নি ভাঙ্গা নাও কইন?

ঃ ক্যান, কইমুনা? হাত গ্যাছে পাও গ্যাছে। হ্যারে দি (তাকে দিয়ে) আর অইবু কি?

ঃ আপনের নিজের রুসনাই (আলো) কদ্দিন আছে, হেইডা ভাইব্যা দ্যাইখছেন কি?

শিবু মনে মনে লজ্জিত হয়ে মুখে জোর করে হাসি বের করে বলল, 'আরে দুর। ঠাট্টা কইরলাম। হে.. হে.. হে...।'

তারপর হাসতে হাসতে চলে গেল।

উৎকণ্ঠা আর রাগে রজব আলীর ভেতর ফুঁসে আছে। অসুখে পড়ে বিছানায় শুয়ে-বসে দিন কাটাতে গিয়ে তাঁর কত কিছু যে চোখে পড়ে ! সবই তাঁর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা জীবন ও সংসার নিয়ে। ভবানির মাকে নিয়েও তাঁর এখন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তাঁর মানস-চরিত্রের নির্মলতা উপলব্ধি করেছে স্বামী। আজই প্রথম উপলব্ধি করেছে সে, তাঁর বউ এলাকার চেংড়া পুলাপানের সাথে ফষ্টিনষ্টির খায়েশ রাখে না। স্বামীকে এখন অচল মানুষ গন্য করে পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক পাতানোরও লালসাবোধ নেই তাঁর। সে সতী নারী। আগে কোনোদিন এরকম ভাবনার দরকার মনে করে নি সে। এখন অনেক কিছু তাঁকে ভাবিয়ে তুলে। নতুন উপলব্ধি জাগায়। স্বামীর প্রতি ভবানির মা'র ভালোবাসার গভীরতা কত, তাঁর বউ প্রকৃতই সতী নারী, এ-জাতীয় আরো নানা কিছু ভাবে এখন রজব আলী।

দু'দিন পরের ঘটনা। দিনের বেলা বারান্দায় শুয়ে আছে রজব আলী। চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। ভবানির মা তাঁর সুডৌল নারীদেহ কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে ঢেকে রাখে না কেন? পড়শীরা জমিদারের ব্যাটি বলুক, তবু ঢাকতে ক্ষতি আছে? নিজের মনের এই অব্যক্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পায় না রজব আলী। তাঁর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার গভীরতা এতদিন পর উপলব্ধি করে অন্তর দগদগ করছে। মনে পড়ছে কেবল অতীত জীবনের কিছু কর্মকান্ডের কথা। ভবানির

www.pathagar.com

মাকে কারণে-অকারণে বকাঝকা, মারপিট-সবকিছু। অনুতাপ আর বেদনা-কাতর রজব আলীর কান্না ছাড়া আর উপায় না থাকলেও সে এখন ভাবে। গভীরভাবে উপলব্ধি করে এবং ভাবে। জীবনে যাঁর নারীত্বের মর্যাদা দেয় নি, সেই নিষ্পেষিত মানবীই এখন তাঁর সহায়হীন জীবনের ঠিকানা।

ভবানির মা হাঁসের পালকে খাবার দিতে গেছে। দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে আসছে। স্বামী বেচারা কি করছে, সে ভাবনার তাড়নায় তাড়াহুড়ো করছে। গরুর পাতেও ঘাসের ঝুড়ি দিতে হবে। গাভীকে দিতে হবে সরিষার খইল আর ধানের ছোলার ছাতু মেশানো খাবার। ভালো খাবার না-খাওয়ালে গাভী ভালো দুধ দেবে না। জজের বাপ খাবারের মধ্যে কেবল দুধটাই খায় এক-আধ গেলাস। অসুখে পড়ার পর থেকে বেচারা ভাত খেতে চায় না এক মুঠোও।

ভবানির মা'র মনে তাড়া। দেরী হয়ে গেল। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, জজের বাপের বিড়ি-চুরুট লাগব কি না? পেশাব-পায়খানার দরকারও পড়তে পারে। সকালে দু'চুমুক দুধ ছাড়া এখন পর্যন্ত কিছুই খায় নি বেচারা। কে জানে খিদে ধরল কি না। তাই গরুর খাবার নিয়ে যাবার আগেই এক-ঝটকা ঢুঁ মারল ঘরে স্বামীর কাছে।

শিউরে ওঠার মতো কান্ড, জজের বাপের চোখে পানি! পানি কেন? কিছু জিজ্ঞেস করলেও জবাব দিচ্ছে না। গলা খাঁকারি দিয়ে নাক টানছে আর হাত দিয়ে চোখ মুছছে। বালিশের ওপর-নীচ পুরোটা একদম চপচপে ভেজা। তার মানে উনি বহুসময় ধরে এ-ভাবে কেঁদে যাচ্ছে। ভবানির মা হো-হো করে উঠল। রজব আলী জড়কণ্ঠে মুখ খুলল, 'তুমি কাইন্দোনা (কেঁদো না)।'

ঃ আপনের কান্দন দ্যাখলে (কাঁদা দেখলে) আমার কুল আলম আইন্দ্যার অইয়া যায় (সমগ্র জগত আঁধার হয়ে যায়)।

ঃ আমি কান্দি তোমার লাগি। তোমারে জীবনে বউত্ আযাব দিছি (বহু কষ্ট দিয়েছি)। আমারে খেমা কইর‍্যা দিউ (ক্ষমা করে দিয়ো)।

ঃ আপনে ইসব কইন না যে (এ-সব বলুন না যেন)। আপনেরে আল্লাহ বাঁচাইবু।

কান্নার শোরগোল শুনে পড়শী মহিলারা এলেন। সফর বানু, জরিনা বিবি, সখিনা বিবি, এংরাজের মা, ভিমরাজের মা, জলিখা বিবি-আরো অনেকে।

রজব আলী নীরব হয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না। কিছুক্ষণ পর পড়শীদের দিকে মৃদু ইশারা করে বিলাপ-জড়িত কণ্ঠে বলল, 'হাটি-হাম্‌ছায়ারে কও (পাড়া-পড়শীকে বল), হগ্‌গলে আমারে খেমা কইরা দ্যায় যে (সকলে আমায় ক্ষমা করে দেয় যেন)। আমি চইল্যা যাইতাছি।'

www.pathagar.com

এ-জাতীয় কথাবার্তা শুনে সকলের মন খুবই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। মহিলাদের কেউ কেউ নীরবে কাঁদছেন। উদ্বেগাকুল ভবানির মা জানতে চাইল, 'এইলাহান কথা কি'র লাইগ্যা কইতাছইন (এ-ভাবে কথা কিসের কারণে বলছেন)?'

ঃ আমার বস বাউন্ন বচ্ছর চলতাছে (বয়স বায়ান্ন বছর চলছে)। ইসাব কইরা দ্যাখ্ছি (হিসেব করে দেখেছি)। অহন (এখন) যে কাল ব্যারামি (অসুখ) ধইর্ছে, মনে লইতাছে থুইয়্যা যাইবুনা (রেখে যাবে না)। অকরসাত (অকস্মাৎ)। লইয়া যাইবু। আমি মইরলে (মারা গেলে) তুমি কাইন্দোনা (কেঁদো না)। হাত উঠাইয়া দোয়া কইরো। তোমার দোয়া কামে আইবু। বিরথা যাইবুনা (বৃথা যাবে না)। আলিম-উলেমা কইয়্যা আমার লাইগ্যা দোয়া করাইউ (আলেম-উলামাকে বলে আমার জন্যে দোয়া করায়ো।'

ভবানির মা কোনো কথা বলতে পারছে না। কেবল হেঁচকি দিচ্ছে আর চোখ মুছছে। অন্য মহিলারাও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভবানির মাকে তাঁরা কী বলে শান্তনা দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না কেউই। সবাই নির্বাক হয়ে গেছেন।

পাড়া-পড়শীরা একজন একজন করে চলে গেলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানা ছাড়া কারো মুখেই কোনো শব্দ নেই। ভবানির মা হাঁটুমুড়ে বসে আছে স্বামীর মুখের কাছে।

রজব আলীর ভেতরে অনেক কথা জমা হয়ে আছে। হাত তুলে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'জজ মিয়ারে কইও, আমার মউতের সময় কানের কাছে নবীজীর কলেমা শুনাইতে। জজ মিয়া আমার ফইলা ফরজন্দ (প্রথম সন্তান)। আদরের ধন।'

আবারো এক হাত দিয়ে চোখ মুছল রজব আলী। দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'দারোগা মিয়ারে কইও আমার মুহে পানি দিতু। ঝাড়ু মিয়ারে কইও পাখা দি বাতাস কইর্তু। আর তুমি কুরআন মজিদ পইড়ু।'

ঃ আমি পইড়তে জানিনা।

রজব আলী নিরাশ কণ্ঠে বলল, 'দ্যাহো (দেখো), আমার তিনপুতেরা গ্যাছে কই? ডাহো তাঁরারে (ডেকো তাঁদেরকে)। আমার ছামনে (সামনে) নিয়া আও।'

ভবানির মা পাগলিনীর মতো বের হল ঘর থেকে। এ-দিক থেকে ও-দিকে। এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। দৌড়ঝাপ চালাতে লাগল তিনপুত্রের খোঁজে।

তিনপুত্র এল। পুত্রদের সামনে তাঁদের বাবার অন্তিম ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করল মা। কিন্তু হায়! জজ মিয়া কলেমা জানে না। দারোগা মিয়া? সে-ও জানে না। ঝাড়ু

www.pathagar.com

মিয়াও না। ভবানির মা বলল, 'আমি জানি মনে লইতাছে।'

রজব আলী হাউমাউ করে আহাজারি শুরু করল, 'হায়-হায়! আহা-হা! আমি তিনপুতের বাপ। আমার মউতের সময় আমার তিনপুত কামে আইলুনা (কাজে এল না)। তুমি গ্যালা কই? কদ্দুর জানো কও হুনি (কতটুকু জান বল শুনি)। দেরী কইররুনা। জলদি কইরা কও।'

ভবানির মা কালেমায়ে তাইয়্যেবা আর দোয়া ইউনুছের কয়েক শব্দ গুলিয়ে একাকার করে বলল, 'লাইলাহা ছুবহানাকা ..... পরের হরফ জেহেনে আইতাছেনা।'

ঃ যদ্দুর কইছো, অদ্দুর ঠিহ্ আছে কি না আমি নিজেও কইতে পারবামনা। হায়-হায়! জীবনে খালি অকামের কামই কইরলাম। কামের কাম কইরলামনা। অহন যদ্দুর বুঝি, আগে যুদি বুইঝতাম! হায়!'

ঃ আহ্! কেউ যুদি আমগ হগগলরে শিখাইতু আইয়া (আমাদের সকলকে শেখাত এসে) আল্লাহ্-নবীর কথা?

ঃ আম্‌রা অইলাম গেরামের মরখো (মূর্খ) মানুষ। আমগ আর জিগায় কেডা (জিজ্ঞাসা করে কে?) কোথা তনে আইবু কেডা (কোথা থেকে আসবে কে) শিখাইতে আমগ আল্লাহ্-নবীজির কথা? অমুন দরদী কেডা আছে?

ঃ আপনে একদিন কইছিলেন, উজীরপুরের মউলানা সাব কইছে, এ্যাই দ্যাশও একদিন নবীর তরীকা মতে চইলবু। সরকারের লোকেরা আইয়া মাইনসেরে (এসে মানুষকে) আল্লাহ্-রাসুলের কথা জানাইবু। নমাজ-বন্দেগী শিখাইবু। ভালা পথে চলন শিখাইবু। হেইদিন আইতে (সেদিন আসতে) আর কদ্দুর আছে বাকী?

ঃ তোমার এইকথার জওয়াপ আমার জানা নাই আলাতন। এইদ্যাশের পাবলিক আর লেম্বর (মেম্বার), চেয়ারম্যান, নেতা, মন্ত্রী, হেই মিয়ারা কইতে পাইরবু। আমি পাইর্‌বাম্‌না।

রজব আলীর বিদগ্দ হৃদয়ের কান্না থামছে না। বড় বড় চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুইন্যাইডা বড় ভেজালের জাগা (জায়গা)।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চোখ বুজে ফেলল রজব আলী। চলে গেল এ-দুনিয়া ছেড়ে। বিদেয়বেলা তাঁর মনের একান্ত সাধ নবীজীর কলেমা আর শোনা হল না। কুরআন মজীদও পাঠ করল না কেউ।

প্রিয়তম স্বামীর জীবনের শেষ মুহূর্তে মনের সাধ অপূর্ণ থেকে যাওয়ায় ভবানির মা মর্মাহত হল খুব। অন্তরে সারাক্ষণ আগুন জ্বলে। দুনিয়ার সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিলেও বেদনা যাবে না মনের। দুনিয়ার মানুষ নবীজীর কলেমা জানে। কিন্তু

www.pathagar.com

প্রাণের স্বামী কি আর দুনিয়ায় ফিরে আসবে কোনো দিন? এক মুহূর্তের জন্যে কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে?

তরুণ বয়সী ধনু মেম্বার লোক হিসেবে মহৎ এবং দানশীল। নামাজ-বন্দেগীতে পাকা। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষের সেবা করতে ভালোবাসেন। এলাকার মুসলমান-হিন্দু সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র। লেখাপড়া না-করলেও অনেক বুদ্ধি-বিবেক রাখেন। স্থানীয় প্রশাসনের নানা পর্যায়ে তাঁর রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। যথেষ্ট দায়িত্ববানও। গ্রামে একখানা বক্তব পরিচালনা করছেন নিজ খরচে। আগামীতে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা করার চিন্তা-ভাবনা। রজব আলীর অসুখের সময় ভালো চিকিৎসার জন্যে সাধ্যমতো সহায়তা কম করেননি। কিন্তু বাড়ীর বাইরে অবস্থানের কারণে জানাযায় আসতে পারেন নি। এক সপ্তাহ পর বাড়ী ফিরে আজ এসে হাজির হয়েছেন রজব আলীর বাড়ী। সাথে লোক-লস্কর বেশ ক'জন। আজ এসে আগে রজব আলীর কবর জিয়ারত করলেন।

মেম্বার সাবের আগমন-সংবাদ শুনে হদ্দমুদ্দ হয়ে পাড়ার লোকজন মুহূর্তে জড়ো হয়ে গেছে। ভবানির মা'র উঠোনে তিল ধারনের ঠাঁই নেই। মেম্বার সাব হেসে উপস্থিত লোকদের সামনে তাঁর লোক-লস্করের পরিচয় তুলে ধরতে লাগলেন। একজনের বাহুতে আঙুল দ্বারা গুঁতো দিয়ে দেখালেন, 'তাইনে অইলেন আমগ ইউনিয়নের সেরখেটাউরী (ইউনিয়নের সেক্রেটারী/সচিব)। বিদ্যান লোক। সরকারের হগগল দান-দক্ষিণা এই মিয়ার হাত দি আসা-যাউয়া করে।'

লোকজন মেম্বারের চিনিয়ে দেয়া লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে গভীর উপভোগের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

মেম্বার আরেকজনের শরীরে মৃদু ধাক্কা দিয়ে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 'তাইনেও সরকারের লোক। কলিকল্পনা অবিচার (পরিবার-পরিকল্পনা অফিসার)। খুব ভালা মানুষ।'

এবারো লোকজন তাকে আগের মতোই দেখতে শুরু করল।

পেছনে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে হাতটেনে সামনে আনলেন মেম্বার। এই লোক সকলের সামনে এসে মুখে বন্ধ করে মিটিমিটি হাসছেন। মেম্বার বললেন 'তাইনেরে (তাকে) আপনেরা চিনেন। দুই লম্বর ওয়াটের লেম্বর (২নং ওয়ার্ডের মেম্বার)। সাংঘাতিক বিজ্ঞলোক। বিদ্যাও আছে কম না।'

লোকজন সরল হাসি হাসল। কেউ কেউ বলল, 'তাইনেরে চিনাইতে অইবু? আমগ দ্যাশ-গেরামের নিজের লোকনা?'

www.pathagar.com

ডান দিকে কয়েক পা এগিয়ে দুজনের কাঁধে একসাথে দু'হাত রেখে মেম্বার বললেন, 'তাইনেরাও সরকারের বিরাট বড় অবিচার (অফিসার)। এনজো পাট্টির লোক (এনজিও গোষ্ঠীর লোক)। বিদেশ তনে আউয়া ট্যাহা দি আমগ হচেতন করইন (বিদেশ থেকে আসা টাকা দিয়ে আমাদের সচেতন করে থাকেন)। সাংঘাতিক দামী লোক। বুইঝ্যেননা? দামী লোক না অইলে বিদেশে ট্যাহা দিবু?'

লোকজন বিস্ময়-ভরা চোখে 'দামী' লোকগুলোকে ভালোমতো দেখে একধরনের তৃপ্তিবোধ করল।

পরিচয়পর্ব শেষ করে মেম্বার এবার বক্তব্য আকারে দু'চার কথা পেশ করতে শুরু করলেন, 'এই গেরামে আর কোনো অভাব থাইক্‌বুনা। কোনো অভাব আমি থাইকতে দিবামনা। রেইন (ঋণ) পাইবার বেবেস্থা অইছে। গত বচ্ছর টিফেল দিছি (টিউবওয়েল দিয়েছি)। ইবার দিবাম লেপটিন (এবার দেব ল্যাট্রিন)। আমার বাইতে (বাড়ীতে) পোখরির পাড়ে আইন্যা থুইছি (এনে রেখেছি)। ঘরে ঘরে একখান লইয়া আইবেন। ট্যাহা-টোহা লাইগবুনা।

সকলে শুনে খুব খুশী হল। কিন্তু ভবানির মা এ-টুকু বক্তব্যে খুশী হতে পারল না। সে তরতর করে ব্যক্ত করল নিজের অনুভূতি, 'রেইন কি লাভ-ছাড়া (সুদবিহীন) দিবেন? আমগ সুদের উপরে ট্যাহা হাওলাত দিলে আর পাকা করা লেপটিন (ল্যাট্রিন) দিলেই খালি হগগল অভাব চইল্যা যাইতুনা। আমগ মত মরখো (মুর্খ) মাইনসের বড় অভাব আরও বউত আছে। আল্লাহ্ চিনি না-নবী চিনি না। পাক-নাপাক পর্দা-পুশিদা জানি না। মরনের সময় দয়াল নবীর কলেমা নসিব হয় না। আমগ কি আত্মা নাই? পরকাল নাই? হেইডা কেডা দ্যাইখবু? কোনদিন দ্যাইখবু?'

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com